ফুড কনফারেন্স

আবুল মনসুর আহমদ

ফুড কনফারেন্স

আবুল মনসুর আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম সংস্করণ | ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
ফাল্গুন ১৩৭৮

এগারতম মুদ্রণ | ফেব্রুয়ারি ২০১১
ফাল্গুন ১৪১৭

প্রচ্ছদ | সমর মজুমদার

বর্ণবিন্যাস | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | বেলাল অফসেট প্রেস
৪ পি. কে. রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য | **একশত বিশ টাকা মাত্র**

FOOD CONFERENCE—Written by Abul Mansur Ahmed. Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : February 1969 & 11th Print : February 2011

Price : ***Tk. 120.00 Only.***

ISBN 984 11 0429 9

ভাই আয়নুল হক খাঁ

দুনিয়ার ফুড-কনফারেন্সে ভিযিটার্স গ্যালারিতে তোমার আমার বরাবরের পরিচয়। ভিযিটার্স গ্যালারি থেকে সটকে তুমি ডেলিগেইটস এনক্লোযারে ঢুকে না পড়, তারই জন্যই তোমায় গলায় ভিযিটার্স টিকিটের এই মালা ঝুলিয়ে দিলাম।

আবুল মনসুর আহমদ

প্রকাশকের নিবেদন

সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী শোষণের ফলে দুনিয়ার শস্যভান্ডার সুজলা–সুফলা বাংলা ১৩৫০ সালে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক লোক-ক্ষয়ী আকালের শিকার হইয়াছিল। বাংলার দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই হৃদয়বিদারক আকালের বাস্তব ছবি আঁকিয়াছিলেন: শিল্পী জয়নুল আবেদিন আঁকিয়াছিলেন ব্রাশ ও তুলিতে আর আবুল মনসুর আঁকিয়াছিলেন নকশার কলমে। তাঁর অমর সৃষ্টি ফুড্ কনফারেন্সই এক নকশা। বেদনার তীব্র কশাঘাত। এই কন্‌ফারেন্স পড়িয়াই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী অন্নদাশংকর রায় লিখিয়াছিলেন: 'আয়না' লিখিয়া আবুল মনসুর প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিলেন আর 'ফুড-কন্‌ফারেন্স' লিখিয়া তিনি অমর হইলেন।

অনেক আগের কাহিনী ও চিত্র। ইতিমধ্যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি কিন্তু সে চিত্র আজও তেমনি জীবন্ত ও বাস্তব। শস্যভান্ডারে আজও তেমনি আকাল চলিতেছে। তাই আমি 'ফুড-কন্‌ফারেন্স'কে নূতন সাজে সাজাইয়া পাঠকদের খেদমতে পেশ করিলাম।

উদ্বোধনী

আয়না'র নিস্ত্রি আবুল মনসুর আহমদ 'ফুড-কন্‌ফারেন্স'র আয়োজন করেছেন। তাই কন্‌ফারেন্স উদ্বোধনের দায়িত্ব ফেলেছেন তিনি আমার কাঁধে। এ গৌরবের লোভ আমি সংবরণ করতে পারলাম না।

আবুল মনসুরের 'আয়না'য় মুখ দেখে যারা খুশী হয়েছেন, ফুড কন্‌ফারেন্সও নিশ্চয় তাঁরা পেট ভরে খেয়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন।

'আয়না'য় প্রধানত বাংলার মুসলমানদের সামাজিক জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখানো হয়েছিল। 'ফুড-কন্‌ফারেন্সে' বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় চরিত্রের বাস্তব দিক রূপায়িত করে তোলা হয়েছে।

লেখকের এই রূপায়নকে আমি 'সাধারণভাবে বাস্তব' বলে অভিহিত করায় কেউ যেন মনে না করেন যে, বাঙালি চরিত্রে-এর ব্যতিক্রম নেই এ কথাই আমি বলছি এবং লেখকও এই ধারণা নিয়েই বই দু'খানা লিখেছেন।

তা নয় মোটেই। লেখকের যে সে পূর্বধারণা নেই, তার প্রমাণ এই বইয়ের 'রিলিফ ওয়ার্ক' গল্পের হামিদ চরিত্র। তবে লেখকের সাথে আমারও ধারণা এই যে, হামিদরা বাংলার জীবনে সাধারণভাবে বাস্তব চরিত্র নয়, ওরা ব্যতিক্রম মাত্র। আর লেখক এই 'ব্যতিক্রমদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য এই বই দু'টি লেখেননি। 'সাধারণভাবে বাস্তব'দের ছবিই তিনি অপূর্ব সাহিত্যিক দক্ষতায় এতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গের ভেতর দিয়ে লেখক বাঙালি-চরিত্রের এই সাধারণ বাস্তব দিক দেখিয়ে পাঠকদের প্রচুর হাসিয়েছেন বটে, কিন্তু অবিমিশ্র হাসিই যে আসল ব্যাপার নয়, হাসির পেছনে লেখকের অন্তরের বেদনার দরিয়া যে উচ্ছ্বসিত ধারায় বয়ে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন পাঠকদের তা নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। 'সায়েন্টিফিক বিযিনেস্' গল্পের শেষ বাক্যটি "বাঙালি জাত যেখানে যেখানে বাস করেছে, হাইজিনিকমেজার হিসেবে সে সব জায়গায় বেশ করে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দাও"–এতে জাতীয় চরিত্রের চরম অধঃপতনে লেখকের বেদনা-বোধ আগুনের দাহিকা শক্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ পড়তে হাসিমুখ বোদ্ধা পাঠকের চোখ অশ্রুসজল না হয়ে পারে না।

ব্যঙ্গ ও রঙ্গ, Satire ও wit, বাঙালি সাহিত্যে একেবারে নেই এ কথা বলা চলে না। তবে এদিক দিয়ে সার্থক রচনা নিতান্তই পরিমিত। আমার মনে হয় আবুল মনসুর আহমদ এই মুষ্টিমেয় সার্থক শিল্পীদের অন্যতম প্রধান।

এতটুকু মন্তব্য করেই-আই নাউ ডিক্লেয়ার দি কন্‌ফারেন্স ওপেন!

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

লেখকের অন্যান্য বই

আত্মকথা
শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু
বেশীদামে কেনা কমদামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা
বাংলাদেশের কালচার
সত্যমিথ্যা
আবে হায়াত
আয়না
আসমানী পর্দা
গালিভরের সফরনামা
আল-কোরআনের নসিহৎ

ফুড্ কনফারেন্স

(১)

দেশে হাহাকার পড়েছে; কারণ নাকি খোরাকির অভাব। সে হাহাকার অবশ্যি ভদ্রলোকেরা শুনতে পাননি। ভাগ্যিস অভুক্ত হতভাগ্যদের গলায় চিৎকার করে কাঁদবার শক্তি নেই।

কিন্তু অভুক্ত কংকালসার আধ-ল্যাংটা হাজার হাজার নর-নারী প্রাসাদশোভিত রাজধানীর রাস্তাঘাটে কাতার করছে। তাতে রাস্তার সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। এইসব রাস্তায় আগে-আগে গাউন শাড়ী পরা পরীর ভিড় হতো। আর আজ কিনা সেখানে অসুন্দর অসভ্য কুৎসিত অর্ধোলংগ স্ত্রীলোকেরা ভিড় করছে! কি অন্যায়!

ভদ্রলোকেরা এটাও বরদাশত করতেন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য পেট্রোলের অভাব হওয়ায় অনেক ভদ্রলোককে ট্রামে চড়তে হচ্ছে। ট্রামে অসম্ভব ভিড় হওয়ায় অনেক ভদ্রলোককে ফুটপাথেও চলতে হচ্ছে। এইসব অভুক্ত কুৎসিত দুর্গন্ধময় অসভ্য লোক ভদ্র লোকদের চলাফেরার ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে। রাস্তায় চলতে গেলে এইসব ময়লা কুৎসিত লোকেরা গা ঘেঁষে চলতে হয়। আর চলবারই কি জো আছে? কি দুর্গন্ধ! হতভাগারা ডাস্টবিনে খোরাকির তালাশ করতে গিয়ে হাতাহাতি মারামারি করে মরছে মরুক। কিন্তু ডাস্টবিনের ময়লা ছড়িয়ে রাস্তাঘাট বিচ্ছিরি ও নোংরা করবার অধিকার তাদের কে দিয়েছে?

শুধু কি তাই? হতভাগারা কি মরবার আর জায়গা পায়নি? মরবে কি ভদ্রলোকদের প্রাসাদের দরজায়? কি মুসকিল? মরা লাশের জ্বালায় ঘর থেকে কি বেরুবার উপায় আছে? বাজার থেকে একটু চিনি-কলা মিঠাই কিনে রওয়ানা হয়েছে ত আর রক্ষে নেই। হতভাগারা ছোঁ মেরে কেড়ে নেয় না বটে, কিন্তু যেভাবে দলে-দলে "বাবু ভিক্ষে দাও"

বলে চারিদিকে ভিড় করে তাতে ভয় হবার কথা নয়? যদিই বা বেটারা কখন গায়ে হাত দিয়ে বসে!

কোথাও মোটর বা ট্রাম থামলে চারদিকে হতভাগা ও হতভাগিনীরা যেভাবে গা'র উপর পড়ে "ভিক্ষে দাও" বলে জ্বালাতন করে, তাতে একেবারে ঘেন্না ধরে যায়। কি উৎপাত!

অতএব ভদ্রলোকেরা পড়েছেন বিষম বিপদে। অফিসে-আদালতে থিয়েটারে-বায়স্কোপে স্বাধীনভাবে চলাফেরা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

কাজেই এর প্রতিকারের জন্য একটা কিছু করতেই হবে। সেটা কি?

ভদ্রলোকেরা বরাবর যা করে থাকেন, তাই। করাও হল তা। অর্থাৎ সভা ডাকা হল। এ দেশে দেশদ্রোহিরাও দেশোদ্ধারের জন্য স্বাধীনতা সম্মিলনী ডাকেন; দজ্জাল স্বামীরাও নারীরক্ষার জন্য নারী-সম্মিলনীতে সমবেত হন; চামড়ার ব্যাপারীরাই গো-হত্যা বন্ধের জন্য কাউ-কনফারেন্সের প্রধান উদ্যোক্তা। অতএব দেশের বড়লোকেরা অন্নহীনদের বাঁচাবার জন্য ফুড কনফারেন্সের আয়োজন করলেন।

(২)

কনফারেন্স বসল টাউনহলে। ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে মেট্রোলাইট হাউস গ্র্যাণ্ডহোটেল ফার্পো এবং গ্রেট ইস্টার্ণের সামনে থেকে অনেক মোটর এসে টাউনহলের সামনে দাঁড়াল। টাউনহল লোকে ভরে গেল।

সভাপতি হলেন শেরে-বাংলা। শেরে-বাংলার উভয় পাশ ঘেঁষে মঞ্চের উপর বসলেন সিংগিয়ে বাংলা, মহিষে-বাংলা, গরুয়ে বাংলা, টাট্টুয়ে-বাংলা, গাধায়ে বাংলা, খচ্চরে-বাংলা, কুত্তায়ে-বাংলা, পাঁঠায়ে বাংলা, বিল্লিয়ে বাংলা, বেজিয়ে বাংলা, শিয়ালে বাংলা, খাটাসে বাংলা, বান্দরে বাংলা এবং আরও অনেক নেতা। এছাড়া ইন্দুরে বাংলা, চুঁহায়ে বাংলা, ফড়িং-এ বাংলা, পোকায়ে-বাংলা, মাকড়ে বাংলা এবং চিঁউটিয়ে বাংলারাও বাদ যাননি। তাঁরাও মঞ্চের দু'পাশে ও সামনে চেয়ার পেতে সভা উজালা করে বসেছেন। হাতীয়ে-বাংলা অতিরিক্ত মাত্রায় কলার রস খেয়ে বিভোর হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি স্বয়ং আসতে না পেরে বাণী পাঠিয়েছেন।

সবার আগে সভাপতির ভাষণ হল। সম্প্রতি তিনি ওযারতির গদি হারিয়েছেন। তাঁর দুশমনরা ওযারত দখল করেছেন। কাজেই তিনি কনফারেন্সের উদ্দেশ্য বুঝাতে গিয়ে প্রথমেই বললেন: হবে না দেশে খাদ্যের অভাব? মরবে না বাঙালি অনাহারে? এমন নিমকহারাম জাত দুনিয়ায় আর একটি আছে? আমি এই হতভাগাদের এত উপকার করলাম; নিজের কামাই করা পঞ্চাশ লাখ টাকা হতভাগাদের সেবায় খরচ করে ফেললাম; অথচ তাদেরই চোখের সুমুখ দিয়ে আমার দুশমনরা আমার ওযারতি কেড়ে নিয়ে গেল; বাঙালি জাত কিনা সেটা বরদাশ্ত করল! তারা কিনা আমার

দুশমনদের ওয়ারিশ জেনে নিল। এমন বেইমান জাতকে খোদা শুধু অনাহারে মারবে না, চুলোর আগুনে তিলে তিলে পুড়িয়ে মারবে।

[illegible]

এইভাবে কনফারেন্সের উদ্বোধন শেষ করে সভাপতি আসন গ্রহণ করলেন।

সভায় উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

সভাপতির দুশমনদের পক্ষ থেকে শিয়ালে-বাংলা প্রতিবাদের আওয়াজ তুললেন। তিনি সম্পর্কে সভাপতির ভাগনে হন। কাজেই সাহসে ভর করে বললেন: সভাপতি মামুজি যে বক্তৃতা করলেন, এই সভার উদ্দেশ্যের দিক থেকে তা নিতান্তই অবান্তর। আমরা রাজনৈতিক দলাদলি করতে এ সভায় আসিনি। দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতেই এখানে সমবেত হয়েছি।

বলেই তিনি এক প্রকাণ্ড ঢেকুর তুললেন; কারণ এইমাত্র তিনি ফার্পো থেকে আসছেন। সেখানে আবার ছুরি-কাঁটার কাজটা একটু বেশি মাত্রায় হয়েছিল।

শিয়ালে-বাংলার বক্তৃতার সমর্থনে ইন্দুরে-বাংলা ও চুঁহায়ে বাংলারা চি চি করতে এবং প্রতিবাদে বিল্লিয়ে-বাংলা ম্যাও ম্যাও করতে লাগল।

সভায় হট্টগোল বেধে গেল। হাতাহাতি দাঁতাদাঁতি ও ঠোঁটাঠুঁটির উপক্রম। সভা পণ্ড হয় আর কি।

এইবার দাঁড়ালেন সিংগীয়ে-বাংলা। সভাপতির দিকে পলকে দৃষ্টি বিনিময় করে তিনি মেঘ গর্জনের সুরে বললেন: আপনারা নাহক চেঁচামেচি করে সভা পন্ড করবেন না। আপনারা মাননীয় সভাপতির কথা বুঝতে পারেননি। তিনি অন্য সব দল বাদ দিয়ে শুধু নিজের দলের লোক দিয়েই ওযারত গড়তে চান, এমন কথা তিনি বলেন নি। তাঁর বক্তৃতার সারকথা এই যে, কোনো একদল ওযারতের গদি দখল করে থাকলে তাতে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হবে না। খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে হলে সকল দলের মিলিত ওযারত গড়তে হবে অর্থাৎ কিনা ন্যাশনাল কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট বানাতে হবে। এতে কারুর আপত্তি হবার কোন কারণ নেই।

সভা এটকু ঠাণ্ডা হল। সিংগীয়ে বাংলা আসন গ্রহণ করলেন।

ঠাণ্ডা হল মানে একেবারেই ঠাণ্ডা। সভায় আর তেমন উৎসাহের বিদ্যুৎ চমকালো না। এই না দেখে সভ্যমণ্ডলীর মনে উৎসাহের বিজলী চমকাবার উদ্দেশ্যে বন্ধুরা বিখ্যাত বক্তা কুত্তায়ে-বাংলাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

কুত্তায়ে বাংলা পিছনের পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং গলা সাফ করার কায়দায় দু'টো বড় রকমের ঘেউ ঘেউ মেরে সভা কাঁপিয়ে তুললেন। তারপর বলতে শুরু করলেন: সিংগীয়ে-বাংলা যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। আমি জানি, শেরে বাংলারও তাই মত। আর হবেই বা না কেন? এটা তো অতি সহজ কথা। যার মাথায় এক ছটাক বুদ্ধি আছে, তিনিই এ সোজা কথাটা বুঝতে পারবেন। একটি মাত্র দল-তা তাঁরা যতই শক্তিশালী, আর যতই বড় হোক না কেন–দেশের সব লোক হতে পারেন না। ফলে একটি মাত্র দল যদি ওযারতি করে, তবে তাতে ঐ দলের সকলের খাদ্য সমস্যার সমাধান হল, এটা ঠিক। কিন্তু যে-সব দল ওযারতি থেকে বাদ পড়ল, তাদের খাদ্য-সমস্যার কি হবে? অথচ যদি সকল দল মিলেমিশে ওযারতি করে, তবে সবারই খাদ্য সমস্যা মিটতে পারে। একেই বলে কোয়ালিশন। এই সহজ সত্যটা যিনি বুঝতে পারেন না, তাঁর বুদ্ধিতে শত ধিক্।

কুত্তায়ে-বাংলার বক্তৃতায় সভায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। চারদিকে গর্বিত দৃষ্টি ফিরিয়ে কুত্তায়ে-বাংলা আসন গ্রহণ করলেন।

সভার বেশির ভাগ লোক শেরে-বাংলার পক্ষে চলে যাচ্ছে দেখে ওযিরদের পক্ষ থেকে গাধায়ে–বাংলা বিকট গলায় চিৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তিনি বললেন: শেরে-বাংলার দল আজ যে বড় সর্বদলীয় কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন, দু'দিন আগে তাঁর এ মত ছিল কোথাও? তিনি যখন আমাদের বাদ দিয়ে ওযারত গঠন করেছিলেন, তখন আমাদের খাদ্য সমস্যার কথাটা বিবেচনা করেছিলেন কি? সে ওযারত টিকিয়ে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা কি তিনি করেন নি? তিনি তাঁর ওযারত বাঁচিয়ে রাখবার জন্য অত চেষ্টা যদি করে থাকতে পারেন, তবে আমরাই বা তা করতে পারব না কেন? আর কুত্তায়ে-বাংলা যে বললেন: আমাদের ওযারত হওয়ায় শুধু আমাদের দলেরই খাদ্য সমস্যা মিটিছে, এটা সত্য নয়। আমরা শেরে-বাংলার ওযারতের চেয়ে বেশি লোককে ওযারতে নিয়েছি। আর যাঁদের ওযির বানাতে পারিনি,

তাঁদের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি করেছি। তাছাড়া কন্ট্রাক্ট ও নমিনেশনাদি দিয়ে অনেক লোককে ওযারতের খুঁটি বানিয়েছি। এতে আমাদের সকলের ভাগ্যেই খাদ্য কম পড়ে গিয়েছে। তাতে করে আমরা কায়ক্লেশে কোন প্রকারে ওযারতির গাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। তার উপর অন্য দলের লোককেও যদি ওযারতে ঢুকতে দেই তবে রাস্তার লোক মরবার আগেই আমরা ওযির-নাযিররা না খেয়ে মরব।

গাধায়ে-বাংলার চোখে আঁসু দেখা দিল। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র না দমে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে পাঁঠায়ে-বাংলা বললেন: ওযিরি করে যদি আপনাদের খাদ্য-সমস্যা মিটছে না, তবে ওযারতি ছেড়ে দিন না; নাহক ওখানে বসে-বসে আর কষ্ট করছেন কেন?

গাধায়ে-বাংলা গর্জন করে উঠলেন: কষ্ট করছি কি আর সাধে? আমরা ওযারতি গদি ছেড়েছি কি, আর অমনি আপনারা তাতে লাফিয়ে চড়ে বসবেন। সেই চিন্তাতেই তো এ আপদ ছাড়তে পারছিনে, এত কষ্ট করেও তাই এ মরা আগলে বসে আছি। আপনাদের সামনে আজ তিন সত্যি করে বলছি, থাকবও বসে সেখানে আপনাদের পথরোধ করে। যদি গদিতে বসে অনাহারেও থাকতে হয় গদিতেই জান দেবো। অনাহারেই যদি মরতে হয়, তবে রাস্তায় পড়ে মরার চেয়ে ওযারতির গদিতে পড়ে মরা অনেক ভাল।

সভা স্তম্ভিত হল। শেরে-বাংলার তালু জিভ্ লেগে গেল। ওই যদি দুশ্‌মনদের অ্যাটিচুড হয়, তবে আর আপসের সম্ভাবনা কোথায়? তবে আর তাঁর দলের লোকদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হবে কি করে? এ সব ফুড কনফারেন্স করে তবে লাভ কি? দলের লোকদেরে স্তোক দিয়ে রাখাই বা যায় আর কতকাল?

তিনি রেগে যাচ্ছেন দেখে সিংগীয়ে-বাংলা চোখ ইশারায় তাঁকে থামতে বলে ইন্দুরে-বাংলার কানে-কানে কি বললেন। ইন্দুরে-বাংলা চেয়ারের উপর চড়ে বলতে লাগলেন: বাঘে-মোষে লড়াই হয়, নলখাগড়ার পরাণ যায়। আমাদের হয়েছে তাই। যা দেখছি তাতে বাঘে-মোষে আপোস হবে না। তবে আর আমরা গরীব লোকেরা কেন এখানে সময় নষ্ট করছি? রাত ন'টা বাজে। বড় লোকদের না হয় কাম-কাজ নেই। কিন্তু আমাদের তো কাম-কাজ রয়েছে। রাত অনেক হয়েছে। রাতের বেলা আমাদের অনেক লোকের কাঁথা-বালিশ কাটতে হবে। নইলে তো আর আমাদের খোরাকি জুটবে না। কাজেই আসুন ভাই সাহেবান, আমরা সভা ছেড়ে চলে যাই।

এই কথায় সভার অনেকেই উঠবার আয়োজন করল।

মহিষে-বাংলা এতক্ষণ কথা বলেননি। সভাপতির একটু দূরে একটা বড় রকমের সোফায় কাৎ হয়ে পড়ে তিনি এতক্ষণ জাবর কাটছিলেন।

সভা পণ্ড হয় দেখে তিনি এইবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন: আমি একটা আপোস-প্রস্তাব করছি। আশা করি শেরে-বাংলার দল তা গ্রহণ করবেন। অনেক সাধ্যি-সাধনা করে আমরা ওযারতি দখল করেছি; ওটা আমরা ছাড়তেও পারব না, অন্য কাউকে

শরিকও করতে পারব না। কিন্তু তাই বলে অপর দলের খাদ্য সমস্যার সমাধান না হোক, এটাও আমরা চাইনে। আসুন, আমরা সব দল মিলে একটা ফুড কমিটি গঠন করি। এই কমিটির সভ্যেরা মন্ত্রিত্বের ক্ষমতা পাবেন না বটে, কিন্তু তাঁদের সবাইকে মন্ত্রিগণের সমান মাইনে দেওয়া হবে। শেরে-বাংলার দলের যত-ইচ্ছে লোক এই কমিটির সভ্য হতে পারবেন।

সভায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

শেরে-বাংলা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আমার দলের লোকদের কমিটিতে মনোনয়ন করবার ভার আমার উপরই থাকবে তো? আমার আত্মীয় স্বজন বলে কাউকে বাদ দেওয়া হবে না তো?

মহিষে-বাংলা বললেন: তা সম্পূর্ণ শেরে-বাংলার এখতিয়ার; ও-ব্যাপারে আমরা কেউ কোন কথা বলব না।

শেরে-বাংলা সভাপতির আসন ছেড়ে উঠে সিংগীয়ে-বাংলার ও পাঁঠায়ে বাংলার কাঁধে হাত দিয়ে তাঁদের এক কোণে নিয়ে গেলেন; সেখানে একটা ছোটখাট সভা হল। অনেক কানাকানি হল

তারপর চেয়ারে ফিরে এসে শেরে-বাংলা বললেন: তথাস্তু। আমি আপোস-প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

সভায় আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল

শেরে-বাংলার প্রস্তাবে মহিষে-বাংলার সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলার খাদ্য সমস্যা সমাধানের মহান উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় ফুড কমিটি গঠন হল

"আসুন আমরা একটা ফুড কমিটি গঠন করি "—মহিষে-বাংলা

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ হল।

সভাশেষে গাধায়ে-বাংলা ঘোষণা করলেন: জাতির এই দুর্দিনে বাংলার জাতীয় নেতাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পুণ্য দিনের স্মৃতি স্বরূপ তিনি আগামীকাল গ্র্যাণ্ডহোটেলে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করবেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সে ভোজ-সভায় দাওয়াত করা হচ্ছে।

সভায় ধ্বনি উঠল: গাধায়ে-বাংলা কি–জয়!

(৩)

গ্র্যাণ্ডহোটেলে ফুড কমিটির বৈঠক। শেরে-বাংলা মহিষে-বাংলা সিংগীয়ে বাংলা ছাগুয়ে-বাংলা গরুয়ে-বাংলা গাধায়ে-বাংলা কুত্তায়ে-বাংলা পাঁঠায়ে– বাংলা বিল্লিয়ে-বাংলা শিয়ালে-বাংলা প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় সমস্ত বাঙালিই ফুড কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন। মন্ত্রীরা এক্স অফিসিও মেম্বর। তাঁরা অবশ্য কমিটির মেম্বর হিসেবে আর মাইনে পাবেন না; তবে মিটিং-এ হাজির হওয়ার জন্য ফিস্ পাবেন। সদস্যের মধ্যে শেরে-বাংলার ভাগনের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাতে কারুর আপত্তি করার উপায় নেই; শেরে-বাংলার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে সেই শর্তেই। আর খোদ শেরে-বাংলা বলেন: শেরে বাংলার ভাগ্নে হলে ব্রিলিয়েন্ট হতেই হবে, যথা শিয়ালে-বাংলা।

সর্বদলীয় নেতারা সবাই বৈঠকে হাজির। ইন্দুরে–বাংলা চুঁহায়ে বাংলা ও চিঁউটিয়ে-বাংলা প্রভৃতি ক্ষুদে নেতারা ফুড কমিটির সদস্য না হলেও তারা বৈঠকে হাজির। কারণ কমিটিতে খাদ্য সমস্যার থিওরেটিক্যাল আলোচনা শেষে গাধায়ে-বাংলার খরচে প্র্যাকটিক্যাল ডিমনষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই জন্যেই গ্র্যান্ড হোটেলের মতো সুসজ্জিত ল্যাবরেটরিতেই ফুড কমিটির বৈঠক দেওয়া হয়েছে।

সভার কাজ শুরু হল। শেরে-বাংলা সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। প্রথমেই পাঁঠায়ে বাংলা পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ করলেন। তিনি বললেন: কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে যেমন থিওরেটিক্যাল শিক্ষাদানের আগে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষাদান শুরু হয়, খাদ্য সমস্যার আলোচনাতেও তেমনি প্র্যাকটিক্যাল কাজটাই আগে হতে পারে না কি?

অনেকেই হর্ষধ্বনি করে পাঁঠায়ে-বাংলার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। গরুয়ে বাংলা তো দস্তুর মতো একটা বক্তৃতাই করে বসলেন।

কিন্তু সমস্ত উৎসাহ উদ্যম দমিয়ে দিলেন খোদ সভাপতি শেরে-বাংলা। তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ ক্ষুরধার ভাষায় বললেন: আমার বন্ধুদ্বয় পাঁঠা ও গুরু নাম সার্থক করেছেন; নইলে এমন আহমকী প্রস্তাবও কেউ করতে পারে? এখনই খাদ্য সমস্যার প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশনে হাত দিলে আমাদের লোকসান হবে, হোটেলওয়ালারই হবে লাভ। কারণ থিওরেটিক্যাল আলোচনায় ঘন্টা-দু'ঘন্টা বক্তৃতা করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ডিমনস্ট্রেশনে হাত দিলে তাতে আমরা যত হাত সাফাই ও দাঁতসাফাই দেখাতে পারব, এখন নিশ্চয়ই তা পারব না।

সকলে সভাপতির দূরদর্শিতার তারিফ করতে লাগলেন।

সভার কাজ শুরু হল।

সভাপতি বললেন: আমাদের সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দিল কেন, সেই কারণটাই আমাদের আগে খুঁজে বের করতে হবে। অতএব আমি এ বিষয়ে সদস্যদের অভিমত জানতে চাই।

সভাপতির আদেশে প্রথমে দাঁড়ালেন সিংগীয়ে-বাংলা। তিনি বললেন: বাংলায় খাদ্য সমস্যার একমাত্র কারণ মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি ও বাংলায় সাম্প্রদায়িক ওযারত। মুসলমানেরা যতদিন পাকিস্তান দাবি ত্যাগ না করছে এবং যতদিন জাতীয়তার ভিত্তিতে বাংলায় কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট গঠিত না হচ্ছে, ততদিন বাংলার বাহির থেকে সাহায্যও আসবে না, খাদ্য সমস্যার সমাধানও হবে না।

গাধায়ে-বাংলা আপত্তি উত্থাপন করলেন। বললেন: সিংগীয়ে-বাংলা ফুড কমিটিতে কৌশলে রাজনৈতিক বিতর্কের আমদানি করছেন। এ দিকে আমি মাননীয় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সভাপতি: অবজেকশন ওভারুল্ড। কারণ খাদ্য সমস্যার হেতু সম্বন্ধে যাঁর তাঁর ধারণা প্রকাশ করবার স্বাধীনতা সব সদস্যেরই রয়েছে।

মহিষে-বাংলা খাদ্য সমস্যার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বললেন: সরকারী যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কংগ্রেসী সাবোটাশ আন্দোলনই বাংলার খাদ্য সমস্যার কারণ। এই আন্দোলনের গোড়াতে রয়েছে অখণ্ড হিন্দুস্থানী মনোভাব। অতএব অখণ্ড হিন্দুস্থানই বাংলার খাদ্য সমস্যার একমাত্র কারণ।

কুত্তায়ে-বাংলা তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিতে গিয়ে বললেন: আসল কথা কি জানেন? আপনারা যাকে খাদ্য সমস্যা বলছেন, ওটাকে আমি সমস্যা হিসাবে দেখছি না—ওটা আসলে একটা মূল্য বৃদ্ধি মাত্র। জিনিসের দাম বাড়ে দেশবাসীর ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি পেলে। আমাদের দেশে যে চালের দাম বেড়ে চার টাকার জায়গায় চল্লিশ টাকা মণ হয়েছে, তাতে বুঝতে হবে বাঙালির ক্রয়-শক্তি দশগুণ বেড়ে গেছে। এটা বাংলার অর্থ-স্বাচ্ছল্যেরই লক্ষণ। এই ধরুন, আমরা এই যে হোটেলে খানিক পরেই খেতে বসবো, তার দাম ছিল আগে 'মিল'-প্রতি পাঁচ টাকা। কিন্তু আজ আপনারা যে খানা খাবেন, তার দাম 'মিল' প্রতি দশ টাকা। তবে কি বুঝতে হবে গ্র্যাণ্ডহোটেলে খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে? তা নয় বরঞ্চ বুঝতে হবে যে আমরা যারা এই হোটেলে খানা খেয়ে থাকি, তাদের অবস্থা সচ্ছল হয়েছে। কাজেই বাংলায় চল্লিশ টাকা চালের মণ দেখেই যারা এটাকে খাদ্য সমস্যা বলছেন তাঁরা অর্থ শাস্ত্র পড়েন নি। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যুদ্ধের দরুন দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা হঠাৎ ভাল হয়ে গিয়েছে বলেই জিনিসপত্রের দামও হঠাৎ এত বেড়ে গিয়েছে।

বাধা দিয়ে বিল্লিয়ে-বাংলা বললেন: বন্ধুবর কুত্তায়ে-বাংলা চালের কন্ট্রাক্টরি করে কিছু টাকা মেরেছেন বলে টাকার গরমে দেশের খাদ্য সমস্যাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কোলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় যে রোজ শত-শত লাশ পড়ে থাকে, এটাও কি বাংলার আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ?

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে একটু বিদ্রুপের সাথে হেঁ-হেঁ করে কুত্তায়ে বাংলা বললেন: 'স্টেটসম্যান' ও 'অমৃতবাজারে' কয়েকটা ছবি দেখেই বন্ধুবর ধরে নিয়েছেন, কোলকাতার ফুটপাত মরা লাশে ভরে গিয়েছে। আসলে কিন্তু ওসব খবরের কাগজওয়ালাদের নাটকীয় বাড়াবাড়ি, ওভার ড্রামাটিয়েশন। হাসপাতালে কিছু লোক মারা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারা অনাহারে মারা যাচ্ছে, কি বেশি খেয়ে পেটের পীড়ায় মারা যাচ্ছে, তার কি কেউ খবর নিয়েছেন?

কুত্তায়ে বাংলা আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন। সভাপতি ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন: আরো অনেক বক্তা রয়েছেন। এদিকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেরও সময় হয়ে এল। কাজেই প্র্যাকটিক্যালের পরেও আমাদের এই থিওরিটিক্যাল আলোচনা কনটিনিউ করতে হবে। তখন অন্যান্য বক্তারা নিজ নিজ মত বলতে পারবেন। সভাপতি হিসাবে আমিও নিজের মত তখনই দেব। এখন এইটুকু মাত্র আমি বলে রাখতে চাই যে, যত কথাই আপনারা বলুন, সমস্যার মূল কারণটার ধারে কাছেও এখনও আপনারা যাননি। আমার শ্রদ্ধাভাজন সিংগীয়ে বাংলা এ বিষয়ে সত্যের কাছাকাছি গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই পথভ্রষ্ট হয়েছেন। ন্যাশনাল গভর্ণমেন্ট বা কমিউনাল গভর্নমেন্ট আসল কথা নয়। আসল কথা এই যে, আমার ওয়ারতি কেড়ে নিয়ে গভর্ণর আমার উপর যে অবিচার করেছেন, সে অবিচারের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত বাংলার ভালাই হতে পারে না। বাঙালি যতদিন সেই বেঈমানির প্রতিকার না করবে, ততদিন তাকে একটার পর আর একটা বালা মুসিবত পোহাতেই হবে।.........

ততক্ষণ ডাইনিং হলে ছুরি-কাঁটার ঝনঝনানি পড়ে গিয়েছে। কাজেই সভাপতির বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই সদস্যরা একে একে উঠে পড়লেন। অগত্যা সভাপতি সাহেবও লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেককেই পিছনে ফেলে ডাইনিং হলে প্রবেশ করলেন।

অতঃপর সেখানে যে মারের ব্যাপারটা শুরু হল এবং সে ব্যাপারটা অব্যাহত গতিতে প্রায় ঘন্টা খানেক যেভাবে চলল, তাতে এটা বোঝা গেল যে সমবেত ভদ্রলোকদের শুধু মধ্যাহ্নের নয়, ঐ রাতের বেলার খাদ্য সমস্যারও সমাধান হয়ে গেছে।

(৪)

ডাইনিং হল থেকে ফিরে এসে যে সভা বসল, তার আবহাওয়া হল অনেক শান্ত এবং আমাদের মেজাজও হল অনেকটা খোশখোশাল। বক্তাদের বক্তৃতার মধ্যে উগ্রতা

রইল না। একের প্রতি অন্যের আক্রমণের তীব্রতা থাকল না। সব ব্যাপারে ইউন্যানিমাস হবার একটা আগ্রহ যেন সকল দিক থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

সময় বুঝে টাটুয়ে-বাংলা দাঁড়ালেন এবং একটা হৃদয়গ্রাহী চি-হি-হি দিয়ে বললেন: আসল কথা কি জানেন? সিংগীয়ে বাংলা যা বললেন, তাও সত্য, আবার কুত্তায়ে-বাংলা যা বললেন, তাও সত্য। অর্থাৎ কিনা বাংলায় খাদ্য সমস্যা আছেও আবার নাইও। আছে বললেই আছে, আর নাই বললেই নাই। এখানে যখন আমরা সকল দলের নেতারা একতাবদ্ধ হয়েছি, তখন আমাদের সব দলের মতই মেনে চলতে হবে। কাজেই আমরা সমস্যা আছেও বলব, আবার নাইও বলব।

এই নিতান্ত আফটার-ডিনার-গোছের বক্তৃতায় সভার চারদিকে করতালি ও মারহাবা পড়ে গেল। করতালি থামলে খচ্চরে-বাংলা ইনফর্মেশনের নুক্তা হিসেবে জিজ্ঞেস করলেন: সমস্যাটা যখন সর্বদলীয় নজর থেকে দেখা হচ্ছে, তখন সমাধানটাও সর্বদলীয় বুনিয়াদে হবে তো?

জবাব দিলেন খোদ মহিষে-বাংলা। তিনি খুব জোরসে বললেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমরা যেখানে ওযারতির মেহনত করে মাইনে নিচ্ছি, সেখানে আপনাদের ফুড কমিটির মেম্বর করে বিনা মেহনতে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছি। খাদ্য সমস্যার দিক থেকে দলাদলি আমরা রাখতে চাইনে, সেটা আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন।

কমিটির সদস্যদের সবাই এতে খুশী হলেন বটে, কিন্তু দর্শকদের ভেতর থেকে চুঁহায়ে-বাংলা আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন: ফুড কমিটিতে বিভিন্ন দলের শুধু রুই-কাতলারাই সদস্য হয়েছেন। তাতে তাঁদের খাদ্য সমস্যা মিটল বটে এবং আমরা যারা নেতাদের মুসাহেবের কাজ করছি, তাদেরও একটা হিল্লা হল বটে, কিন্তু চুনায়ে-বাংলা পুঁটিয়ে-বাংলা প্রভৃতি ক্ষুদে নেতাদের কি হল? তাদেরে ভুললে তো চলবে না। তাদের জোরেই তো আমরা ওযির-নাযির ও আইন সভার মেম্বর হয়েছি।

আবার দাঁড়ালেন কুত্তায়ে-বাংলা। দলাদলির যখন অবসান হল, তখন সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরই উপর পড়ল কনস্ট্রাক্টিভ স্কীম দাখিলের ভার। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: আপনারা চিন্তা করবেন না। আমার স্কীমে সকলের জন্যই ব্যবস্থা থাকবে। আমার স্কীমটা আপনাদের খেদমতে পেশ করবার আগে তার মূলনীতিটা আপনাদেরে বুঝিয়ে বলছি:

প্রথমতঃ চালের দাম বেড়েছে বলে চাষীদের হাতে প্রচুর টাকা। কাজেই মফস্বলে খাদ্য সমস্যা নেই। অতএব মফস্বল সম্পর্কে কিছু করবার নেই।

দ্বিতীয়তঃ চাষীরা হাতে টাকা পেয়ে বাবুগিরি করবার মতলবে শহরে ভির করছে; কোলকাতার লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ এই। কাজেই জাতির মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক কোলকাতার ভদ্রলোকদের বাঁচাতে হলে পাড়াগাঁয়ের এইসব আগন্তুককে আবার পাড়াগাঁয়ে তাঁড়িয়ে দিতে হবে। কোলকাতার ভিড় কমে গেলেই শহরের খাদ্য সমস্যাও মিটে যাবে।

(৫)

তারপর? তারপর আর কি? যেমন বেশি খাওয়া তেমনি লম্বা ঘুম। সে ঘুমে ঘুমন্তরা কত রঙিন স্বপ্ন দেখলেন। সে স্বপ্নে তাঁরা কত পরীর রাজ্যে ঘুরে বেড়ালেন। কত পরীর সঙ্গে প্রেম করলেন।

অতি ভোজনের দরুন বদহজমিও হল দু-চারজনের। কাজেই কেউ কেউ দুঃস্বপ্নও দেখলেন। সে দুঃস্বপ্ন থেকে ছটফটিয়ে তারা যেই জেগে উঠলেন, তখন আর-আর সকলেরও ঘুম ভেংগে গেল-বিশেষতঃ হোটেলের ম্যানেজারের তাড়ায়।

সবাই চোখ কচলাতে-কচলাতে গ্র্যাণ্ড হোটেলের বাইরে এলেন। দেখলেন তাজ্জব ব্যাপার! কোলকাতার রাস্তায় আবার পরীর মেলা জমেছে। রাস্তাঘাটের নোংরামি চোখের পলকে দূর হয়ে গিয়েছে। রাস্তাঘাট ও ট্রামের কদর্য ভিড়ও কমে গিয়েছে।

সবাই অবাক! জিজ্ঞেস করে জানলেন, এ সবই কুত্তায়ে-বাংলার স্কীমের দৌলতে হয়েছে। দেশের জনসাধারণ চাষী-মজুর গরীব-দুঃখী ফকির-মিসকিন সবাই খাদ্যাভাবে মরে গিয়েছে। আইন-সভা ও ফুড কমিটির মেম্বর ভদ্রলোকেরা ছাড়া দেশে আর কেউ বেঁচে নেই। শহর ছাড়া পাড়াগাঁয়ে আর লোক নেই। চাল-ডাল তরি-তরকারির আর কোন অভাব নেই। এক ভদ্রলোকেরা কিনবেন কত?

সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। কুত্তায়ে-বাংলা সগর্বে বললেন: কেমন আমি বলি নি যে আমার স্কীমে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবেই হবে? এইবার হলো তো?

সিংগীয়ে বাংলা সোৎসাহে বললেন: শুধু কি তাই ছোটলোকগুলোর উৎপাত থেকেও বাঁচা গেল। এবার আমরা শেরে-বাংলা সিংগীয়ে-বাংলা হাতিয়ে বাংলা ও মহিষে বাংলা খুব আরামসে হেঁ হেঁ হেঁ–

সবাই সে হাসিতে যোগ দিলেন। শুধু ছাগলে বাংলাটা দাড়ি নেড়ে বললেন: তা হল বটে, কিন্তু শেরে বাংলা হাতিয়ে বাংলা প্রভৃতি শুধু জানোয়ারে বাংলারাই আমরা বেঁচে রইলাম। মানুষে বাংলারা যে সবাই মরে গেল।

সে কথায় কেউ কান দিলেন না। বরঞ্চ সকলে সমস্বরে আসমান ফাটিয়ে জয়ধ্বনি করলেন: জানোয়ারে বাংলা জিন্দাবাদ!

গড়ের মাঠের ওপর পাশের ফোর্টের দিক থেকে প্রতিধ্বনি হল: মানুষে বাংলা মুর্দাবাদ।

১৩ আশ্বিন ১৩৫০

আচার্য প্রফুল্ল এলেন রাসায়নিকরূপে। তিনি রসায়নাগারের ল্যাবরেটরিতে দীর্ঘদিন গবেষণা করে বুঝতে পারলেন যে, অক্সিজেন হাইড্রোজেন একত্রে মিশালে যেমন পানি হয়ে যায়, তেমনি দেশসেবা ও টাকা একত্রে মিশাইলে সুন্দর মুনাফায় রূপান্তরিত হতে পারে। বাঙালি জাতি মূলত দেশপ্রেমিক ও সেবাপরায়ণ জাতি। চিন্তাজগতে এরা 'আর্ট-ফর-আর্টস- সেইকে'র সমর্থক হলেও বিষয় জগতে এরা 'বিযিনেস-ফর-বিযিনেসেস সেইকে'র সমর্থক নয়। শুধু 'ব্যবসার জন্য ব্যবসা' করাকে এরা আত্মার অধঃপতন মনে করে। এরা 'ধর্মের জন্য ব্যবসা', 'সেবার জন্য ব্যবসা', 'দেশপ্রেমের জন্য ব্যবসা', 'কৃষ্টি সভ্যতা ও মানবতার জন্য ব্যবসা' করে ব্যবসার আধ্যাত্মিক রূপায়ণের পক্ষপাতী।

খোদাদত্ত অন্তদৃষ্টি বলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'বাঙালির বৈশিষ্ট্য' বুঝতে পারলেন। তাই তিনি ব্যবসার হাইড্রোজেনের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অক্সিজেন মিশিয়ে, বিষয় জ্ঞানের ক্বাথের উপর দেশপ্রেমের ভাবনা দিয়ে এক অপূর্ব মুনাফার পাচন তৈরি করলেন।

এই পাচন বিক্রির জন্য তিনি নিজেই প্রচারে বের হলেন। দেশময় তিনি এই মহৌষধির শাখা দোকান খুললেন। এই দোকানের নাম হল 'খাদি প্রতিষ্ঠান'। এইসব শাখা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা শক্তিতে 'শক্তি' ও 'সাধনা' ঔষধালয়ের শাখার সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল।

আচার্যদের দেশময় উদাত্ত সুরে প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন: ভাটিয়া মাড়োয়ারী দিল্লীওয়ালা সিন্ধী ইস্পাহানিরা তোমাদের দেশের মাল মাত্তা ধন-দৌলত লুটে নিল। তোমরা বাঙালিরা কি জাগবে না? তোমরা কি তেজারতির দিকে মন দেবে না?

আচার্যদেবের প্রাণস্পর্শী আহবানেই হোক, অথবা খোদাতালা বাঙালি জাতকে সুমতি দিলেন বলেই হোক, বাঙ্গালির মনে ব্যবসাস্পৃহা জাগ্রত হল। তারা আচার্যদেবের বক্তৃতা শুনবার জন্য অফিস থেকে ফেরবার পথে সভা সমিতিতে যোগ দিতে লাগল।

আচার্যদেবের 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'র লোভনীয় বিবরণে বাঙালির দেহে রোমাঞ্চ হল। তারা সবাই প্রশ্ন করল: ব্যবসা আমরা করতে রাজি হলাম, কিন্তু সব ব্যবসাই যে পশ্চিমারা দখল করে বসে আছে। আমরা কোথায় হাত দেব?

আচার্যদেব: সে ফন্দি আমি বের করিনি মনে করেছ? তিনকুড়ি বছর বৃথাই অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাড়াচাড়া করছি ভেবেছ? ভাটিয়া মাড়োয়ারীদের মতো অসভ্য জাত আমরা নই। আমরা শিক্ষিত সভ্য ও কৃষ্টিসম্পন্ন জাত। আমরা ভারতের চিন্তানায়ক। আজ বাঙালি যা ভাবে, অপর সকলে তা ভাবে আগামীকাল। আমরা কি শুধু টাকা-পয়সার লোভে ব্যবসা করতে পারি? আমরা যারা 'আর্ট-ফর আর্টস সেইক' থিওরির জন্য জান দিলাম, আমরা যারা 'সত্যম শিবম সুন্দরমের' পূজা করলাম, তারা কি বাট্‌খারা ও দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসতে পারি শুধু-শুধি? আমাদের মতো ইনটেলেকচুয়াল

আর যদি নেহাত বাটখারা নিয়ে বসিই, তবে আমরা তেল-নুনের কারবার করব না। করব আমরা জনসেবা ও দেশপ্রেমের কারবার। বিক্রি যদি আমরা কিছু করিই, তবে চাল ডাল বিক্রি করব না। করব আমরা ধর্ম ও মানবতা বিক্রি।

সভায় বিপুল হর্ষধ্বনি ও কানফাটা করতালি পড়ে গেল। করতালি থামলে একজন বলল: 'আচার্যদেব, সত্য ধর্ম নীতি ও দেশপ্রেম এসব দ্রব্য আমরা বিক্রি করতে পারব খুবই, কারণ এ ব্যাপারে আমরা উস্তাদ। কিন্তু কথা এই যে, এগুলো নিয়ে মন্দিরে-মসজিদে ও মঠে দরগায় তো কারবার চলেই আসছে। তাতে তো বাঙালি জাতের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে না। আমরা আর নতুন কি করতে পারব?

আচার্যদেব মৃদু হেসে বললেন: রসায়নশাস্ত্র, বাবা, রসায়নশাস্ত্র। রসায়নশাস্ত্র না পড়লে এটা বুঝতে পারবে না। আমরা বাঙালি জাত মায়াবাদী, প্রতীক পূজারী। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন একত্রে মিলালে যে জল হয়ে যায় এটা কি মায়া নয়? ব্যবসার মধ্যেও আমাদের এই মায়াবাদের, এই প্রতীক পূজার, এই অক্সিজেন হাইড্রোজেনের খেলা দেখাতে হবে। তোমরা আমার খাদি প্রতিষ্ঠান দেখেছ তো? খাদি ও চরকা একত্রে মিলে কি হয়েছে? এক সূতা খদ্দর তোমরা দেখতে পাও সেখানে? তার বদলে কি দেখতে পাও? চাল, ডাল, তেল ও ভয়ষা ঘি। দেখলে তো মায়া? খাদি ও চরকা মিশে হয়ে গেল চাল তেলও ভয়ষা ঘি। রসায়নশাস্ত্রের এই যে অপূর্ব লীলা, এটা সম্ভব হয়েছে শুধু মায়াবাদের দওলতে। এটাই ব্যবসার মধ্যে ইনটেলেকচুয়াল টাচ। এটাই বৈষয়িকতার উপর আধ্যাত্মিকতার ভাবনা। এটার তাৎপর্য দুমুখো। একদিকে এতে ব্যবসার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণে, ইহকালের সঙ্গে পরকালের সমবায়ে, বিষয়-বুদ্ধির সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠার যোগাযোগে, তেজারতিকে বাঙালির ধাতসহ করা হল; আরেক দিকে এ ব্যবসাকে অবাঙালির প্রতিযোগিতার নাগালের নিরাপদ দূরত্বেও রাখা গেল। আমি খদ্দরের সাইনবোর্ড দিয়ে বিক্রি করছি ভয়ষা ঘি। এটা তামাশা নয়। তোমরা মনে রেখো, এটাই আধুনিক জীবন-দর্শনের মূলনীতি। রাজনীতি ধর্ম ও সাহিত্যের সর্বত্রই এটা সত্য। যা বলবে তা করবে না, আর যা করবে তা বলবে না-এরই নাম রাজনীতি বা ডিপ্লোমেসি। মনের ভাব গোপন করবার আর্টের নামই ভাষা বা সাহিত্য, বিশেষতঃ আধুনিক কবিতা বাইরে নাস্তিকতা প্রচার করে গোপনে কালীতলায় বা মওলাআলীতে মাথা ঠোকা অথবা বাইরে ইসলাম প্রচার করে রাত্রে ফার্পোগ্রাণ্ডে এক পেগ টেনে আসাই এ যুগের ধর্ম। ধর্ম রাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা সত্য বাঙালি আমরা ব্যবসাতেও সেই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করব। যার সাইনবোর্ড দেব, তার ব্যবসা করব না। কাস্টমার্স মাস্ট বি টেকেন বাই সারপ্রাইজ-খরিদ্দারকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে-এটাই আজকার ব্যবসার মূলনীতি। এটা যদি তোমরা করতে পার, তবে কোন জাতিই তোমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারবে না। বাঙালি জাতি ব্যবসা ক্ষেত্রে সকল জাতির শীর্ষস্থান দখল করবে।

বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভা ভঙ্গ হল।

আচার্যদেব দেখলেন, তাঁর জীবনের মিশন এতদিনে সফল হতে যাচ্ছে, তাই তিনি শ্রান্ত দেহে অবসর গ্রহণ করলেন।

বাঙালি জাতির মধ্যে ব্যবসার সাড়া পড়ে গেল। মাতা-পিতাকে, বধূ-বরকে, স্ত্রী-স্বামীকে, পিতা-পুত্রকে, দাদা-নাতীকে দিনরাত ব্যবসার জন্য তাগিদ করতে লাগল।

বাইরের এ শোরগোলকে ব্যবসার হট্টগোল মনে করে প্রাণভরা গর্ব নিয়ে আচার্যদেব তাঁর বিজ্ঞান কলেজের খাটিয়ায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

(২)

আজিজ, নরেন ও ভুঁড়িওয়ালা তিন বন্ধু।

মিস্টার আবদুল আজিজ বি. এ (অনার্স) উঁচুপদের সরকারী কর্মচারী হলেও মুসলিম লীগ পলিটিক্স্ করে, কারণ, লীগনেতারাই সম্প্রতি ওযারতি দখল করেছেন। কিছুদিন আগে যখন হক সাহেবের প্রগতিশীল দল ওযারতি করত, তখন আজিজ ভয়ানক জাতীয়ভাবাদী ছিল; এবং নিজের জাতীয়তাবাদ জাহির করবার জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দু-একবার দেখাও করেছে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু এম. বি. এক হাসপাতালের ডাক্তার। সরকারী চাকুরি করা সত্ত্বেও সে লীগ মন্ত্রিসভার বিরোধী, কারণ ওটা সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা। নরেন ঘোরতর জাতীয়তাবাদী। সেজন্য সরকারী কর্তব্যের ফাঁকে অবসর পেলেই সে হিন্দুসভার আফিসে গিয়ে আড্ডা দেয় এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগ মন্ত্রিসভার কুকীর্তির কথা জাতীয়তাবাদী হিন্দু সভানেতাদের কাছে রিপোর্ট করে আসে।

বাবু রূপারচাঁদ সোনারচাঁদ ভুঁড়িওয়ালা বড়বাজারের মেসার্স বাটপাড়িয়া ভুঁড়িওয়ালা এণ্ড কোম্পানির জুনিয়ার পার্টনার। সে নিজে গো-মাতার ভক্ত ও হিন্দু সভা সমর্থক হলেও মুসলিম লীগের প্রতি তার কোন বিদ্বেষ নেই। সেজন্য সে আজিজকে বলেছে, রায়সাহেবী খেতাব পেলে সে লীগ তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে রাজি আছে। আজিজ ও ভুঁড়িওয়ালার মধ্যে দুস্তিও এই থেকেই।

মির্জাপুর পার্কে আচার্যদেবের বক্তৃতা শুনবার পর আজিজ ও নরেন দুই বন্ধুতে নরেনের হাসপাতালে ফিরে এসেছে। এখানে রোজ সন্ধ্যায় দুই বন্ধুতে আড্ডা বসে। আরো দু'চারজন ইয়ার জুটে। নরেন হাসপাতালের কর্তা বলে তার কোন কাজকর্ম থাকে না। আড্ডা জমে খুব।

আচার্যদেবের বক্তৃতার ফলে দু'জনের মাথায়ই ব্যবসা বুদ্ধি চেপে বসেছে। রাস্তায় সেই তর্ক করতে-করতেই তারা হাসপাতালে ফিরে এসেছে। নরেনের চেম্বারে ঢুকেও সেই তর্কেরই জের চলছে।

নরেন আজিজের দিকে একটা চেয়ার ঠেলে দিয়ে নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসল এবং পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বের করে টেবিলের উপর রেখে পূর্ব কথার রেশ ধরে বলল: তুমি যাই বল আজিজ, আচার্যদেবের প্রত্যেকটি কথা সত্য।
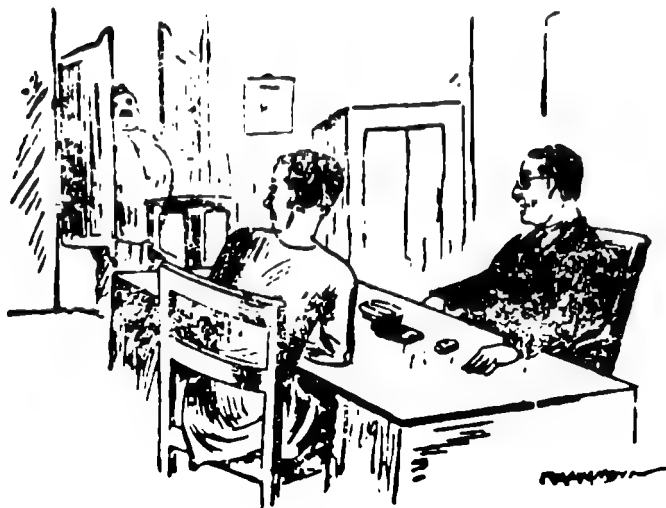
একটি ভুঁড়ির ধাক্কায় স্প্রীং এর হাফডোরটা ফাঁক হয়ে গেল

আজিজ চেয়ারে বসতে বসতে বলল: শুধুই কি সত্য? রোমাঞ্চকর বল। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আমাদের নিজেদের হাতে আসবে কেরানির জাত বাঙালি আমরা টাকার স্তূপের উপর বসে পা নাচাব বড় বাজার ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউর পাঁচতলা দালানগুলোর মালিক হব। কি ফুর্তি, কি আনন্দ।

নরেন বলল: ব্যাটা মাড়োয়ারীদের যুলুম থেকে বাংলা মায়ের উদ্ধার হবে—এতেই আমার সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে। শালারা আমাদের দেশটা লুটে খাচ্ছে।

জবাবে আজিজ সোৎসাহে আরো কি সব বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা ভুঁড়ির ধাক্কায় স্প্রীং-এর হাফডোরটা ফাঁক হয়ে গেল।

দেখা দিল ভুঁড়িওয়ালা।

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে রাম রাম বলে সে আজিজকে উদ্দেশ্য করে বলল: আপনারকে কুঠি থেকে হামি ঘুরিয়ে এইছি। ছোটা সাহেবলোগ বলছে, আপনে [illegible]ডরবাবুকে এহাঁ হোংগে। সে হামি চলে এইছি।

ভাগ্যিস নরেনের কথার পিঠে কথা বলে ফেলবার ফুরসত পায়নি, তাই মনে মনে নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিয়ে আজিজ বলল: মিঃ ভুঁড়িওয়ালা যে! আসুন বসুন। [illegible] আসবেন, তার আর এত কৈফিয়ত কেন। নরেনের চেম্বার তো আপনারই [illegible] কি বল নরেন?

নরেনের মনটা এতক্ষণ ধরে 'ধরণী দ্বিধা হও, দ্বিধা হও" করছিল! এইবার অন্যমনস্ক ত্রস্তব্যস্তভাবে সে বলল: নিশ্চয়, নিশ্চয়। বসুন মিঃ ভুঁড়িওয়ালা।

নরেন বুঝতে পারল, লজ্জায় তার জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভুঁড়িওয়ালা চেয়ারে বসেই টেবিলে পাথালি হাত বাড়িয়ে নরেনের সামনে থেকে সিগারেটের কেসটা টেনে আনল এবং নিতান্ত নিজের জিনিস সাধার মতো করেই আজিজ ও নরেনকে সিগারেট সেধে নিজে একটা সিগারেট ধরাল।

নরেনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আজিজ নিশ্চিন্ত হল। যাক, ব্যাটা কিছু শুনতে পায়নি।

ভুঁড়িওয়ালা নড়ে-চড়ে চেয়ারে ঠিক জুতসই হয়ে বসে সিগারেটে একটা প্রচণ্ড দম দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল: আচারিয়া পরফুল দেবনে আজ বহুৎ উমদা তকরির করেছেন। আপনে লোগ গেলে আলবত খুশী হইতেন।

নরেনের বুক আবার ধড়ফড় করতে লাগল। সে আজিজের দিকে আড় চোখে চেয়ে বলল: কি বললেন আচার্যদেব?

ভুঁড়িওয়ালা সপ্রতিভভাবে বলল: কহলেন সব হক কথা। এই বাঙালি-লোগ খালি নওকরি নওকরি করে বিযনেসকে তরফ খেয়াল করে না। ঔরভী কহলেন, মাড়বারীলোগ বাংগাল মুলুক লুটপাট করতে আছে.....

নরেন ভুঁড়িওয়ালার চোখে-মুখে একটা তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করল: মাড়োয়ারীদের তিনি এত গাল দিলেন, এতে আপনার মনে কষ্ট হল না?

ভুঁড়িওয়ালা হেসে মাথা নেড়ে বলল: রাম রাম। গালিয়া কাহাঁ দিছেন? সব তো হক কথা কহছেন। আপনা দেশমে বাঙালিলোগ তেজরাত করবে না তো কি বিদেশী লোগ তেজারত করবে? হাম মাড়বারী লোগকো আপনে ভদ্দর লোগনে নাহক গলৎ সমঝিয়েছেন।

বলেই ভুঁড়িওয়ালা বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে এমন সব উদারতাপূর্ণ বাস্তববাদী কথা বলতে লাগল, যার ফলে আজিজ ও নরেন অল্পক্ষণের মধ্যেই এ বিষয়ে নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলল। এমন কি, এ কথাও তারা বলে ফেলল যে তারাও আচার্যদেবের সভায় গিয়েছিল এবং এইমাত্র সেখান থেকেই আসছে।

দিল খোলাখুলি যখন শুরু হল, তখন ভুঁড়িওয়ালাও বলে ফেলল যে, সেটা ভুঁড়িওয়ালা জানে এবং খদ্দরের গান্ধীটুপি পকেটে লুকিয়ে ভুঁড়িওয়ালা আজিজ নরেনের পিছু-পিছুই হাসপাতাল পর্যন্ত এসেছে। এমনকি, নরেনের চেম্বারে ঢুকে আজিজ-নরেন যে আলাপ হয়েছে তাও সে শুনেছে।

পরন্তু–ভুঁড়িওয়ালা নিরুদ্বেগে বলে যেতে লাগল:

নরেন বাবুকে বাৎমে দোষের কথা কুচ নেহি আছে; শরমকি বাৎভী ক্যা আছে? হামার মুলুককি তেজরত দুসরা লোক কবযা করলে হামরা দেশওয়ালীলোগ ভী তো

এয়সাই কথা বলত। হামলোগ চাহতে আছে কে বাঙালি লোক তেজারতমে তরক্কী করে।

উদারতার অবাধ আদান-প্রদান হল। শেষ পর্যন্ত ভুঁড়িওয়ালা বলল যে, আগার আজিজ ও নরেন তেজারত করতে চায়, তবে ভুঁড়িওয়ালা ক্যাপিটাল দিয়ে তাদের এমদাদ করতে ভী রাজি আছে।

সেটা নিতে আজিজ নরেন সহজেই রাজি হল। তাছাড়া ভুঁড়িওয়ালার উপদেশ পরামর্শও চাইল, কারণ তারা এ ব্যাপারে নতুন।

সেটাও দিতে ভুঁড়িওয়ালা সানন্দে রাজি হল। সে বলল: এই ধরুন নরেনবাবুকে হাসপাতাল। এই হাসপাতালমে রোজ চাউল, ডাল, আটা, দুধ, ফল, রুটি, চা, চিনি ওগায়রাহ যে সব জিনিস সাপ্লাই হয়, তাতে হাজার রূপায়া দাম লাগে। এই হাজার রূপায়ামে কমসেকম তো তিন চার শো রূপায়া মুনাফা থাকে। বেগানা লোককে কন্ট্রাক্ট না দিয়ে যদি নরেনবাবু বেনামী করকে খোদ এ কন্ট্রাক্ট লে লেয়, তব মাহিনামে নরেনবাবুকো দশ বারো হাজার রূপায়া মুনাফা হোবে। আওর লিজিয়ে, আপ আজিজ সাবকি বাত। উনকা সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টমে লড়াইকে যরিয়ে সে লাখো রূপায়াকা কারবার হৈতে আছে। আজিজ সাব আগার কোই আপনা আদমিকে নামপর উসমেসে দু'চারঠো কন্ট্রাক্ট লে লেয়, তব রূপায়া রাখবার জায়গা কাহাঁ। কন্ট্রাক্ট আপ লোগ লিয়ে লেন, ক্যাপিটালকা ফেকের মৎ করবেন।

নরেন ও আজিজ কিন্তু এতে উৎসাহিত হল না। তারা যা বলল তার সার অর্থ এই: যতই লাভ দেখা যাক, কন্ট্রাক্টরিতে লোসকানের রিস্ক আছে। আজিজ ও নরেন এমন ব্যবসা করতে চায় যাতে শুধুই লাভ আছে, অথচ লোকসানের কোন রিস্ক নেই।

ভুঁড়িওয়ালা অনেক তর্ক করে বুঝাবার চেষ্টা করল যে, এই ধরনের কন্ট্রাক্টে লোকসানের রিস্কটা একটা কথার কথা মাত্র। আসলে লোকসান কোন কালেই হয় না।

কিন্তু আজিজ ও নরেনের কাছে তর্কে হেরে গিয়ে সে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, এতে অন্ততঃ থিওরেটিক্যাল লোকসানের রিস্ক রয়েছে।

সেটুকু রিস্ক নিয়েও আজিজ ও নরেন কারবার করতে রাজি নয়।

ভুঁড়িওয়ালা চোখ কপালে তুলে বলল: অ্যায়সা তেজারতি কাহাঁ মিলে গা বাবুজি, জিসমে নোকসানকা যরা ভী সম্ভাবনা না হোবে?

নরেন ও আজিজ হো হো করে হেসে উঠল। নরেন বলল: সেটা বাঙালির বুদ্ধির একচেটে ব্যাপার, মাড়োয়ারী বা কোন অবাঙালির মাথায় সেটা ঢুকবে না।

আজিজ বলল: তাছাড়া, আমরা বাঙালিরা যে ব্যবসা করব, তাতে ক্যাপিটালের দরকার হবে না। আপনি কিছু মনে করবেন না মিঃ ভুঁড়িওয়ালা, আপনার কাছ থেকে ক্যাপিটাল পেলেও তা আমরা নিতে চাই না। কারণ তাতেও রিস্ক আছে। কে জানে ওই দেনার দায়েই আপনারা একদিন আমাদের কারবার নিয়ে যাবেন না?

ভুঁড়িওয়ালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে হেসে বলল: আব সমঝলাম, আপলোগ হামার সাথে মশকরা করতে আছেন।

নরেন বলল: মশকরা নয় মিঃ ভুঁড়িওয়ালা। আপনার কাছে বলতে দোষ নেই, কারণ আপনি আমাদের বন্ধু ব্যক্তি; আপনি বুঝবেনও না এসব, কারণ এসব সায়েন্টিফিক কথা। হাসপাতালের সাপ্লাই দিয়ে রোজ তিন চারশো টাকা লাভ করতে যে উপদেশ আপনি আমায় দিলেন সেটা আমি কন্ট্রাক্টারি না করেও করতে পারি। আমি যদি রোগীর পথ্য কমিয়ে দি, দুধ, রুটি, মাখন দেওয়া বন্ধ করে দি, আর সাপ্লাই করা সব জিনিস যদি পিছনের দরজা দিয়ে বিক্রি করে দি তবে হিসেব করুন তো কত টাকা থাকবে? তা থেকে শতকরা পঁচিশ টাকা বাদ দিন, কারণ অধীনস্থ লোকগুলোর মুখ বন্ধ করবার জন্য ওদেরকে ওটা দিতে হবে।

ভুঁড়িওয়ালার চোখ দুটো উপরের দিকে ঠেলে উঠতে উঠতে ভুরু দুটোকে কপালের চুলের সঙ্গে একাকার করে দিল। সে ঢোক গিলতে গিলতে বলল: রোগীলোগ কা পথ্য মেরে মুনাফা করবেন ডগডর বাবু? এয়সা অধর্ম করতে পারবেন?

নরেন একটু কঠোর ভাষায় জবাব দিল: আরে রেখে দিন ধর্মের কথা। আপনাদের ধর্মজ্ঞান আমাদের খুব জানা আছে। ভূতের মুখে রাম নাম আর কি!

দুঃখিত হয়ে ভুঁড়িওয়ালা বলল: হোতে পারে বাবুজী হামলোগ ধার্মিক না আছে, হোতে পারে হামলোগ টাকাকে খাতের গউ-মাতাকা চামড়ার কারবার ভী করতে আছে। লেকেন হাসপাতালকা রোগীয়োঁ কা পথ্য চোরি করকে রুপেয়া কামানা? না বাবুজী আজতক হামলোগ সে এ কাম হৈছে না।

নিরাশ গলায় আজিজের দিকে চেয়ে সে বলল: আর আপনে ক্যা তেজারত কোরবেন, আজিজ সাহাব?

আজিজ স্বগর্বে বলল: কন্ট্রাক্টারি করা আমাদের পদ-মর্যাদার হানিকর। আমি নিজে তো তা করবই না, আমার আত্মীয়-স্বজনও তা করবে না। কেন করব? কন্ট্রাক্ট বিলি করেই তো ঢের রোজগার করতে পারব। এর কন্ট্রাক্ট কেটে ওকে আর ওরটা কেটে একে দিব। কন্ট্রাক্টরদের দেওয়া সাপ্লাই পাঁচটা পেয়েই দশটার রশিদ লিখে দিব। রূপা পেয়ে সোনার রশিদ দিব। ধরবে কে আমাদের? স্টোর কিপারদের ভাগ দিতে হবে এই তো? দিব আসল কথা কি জানেন মিঃ ভুঁড়িওয়ালা, বিনা-টাকায় কারো সঙ্গে কথাটি কইব না। বিনা-সালামিতে চাপরাশী-দারোয়ানের চাকরিটা পর্যন্ত দিব না। চাকরি দিয়ে ওদের মাইনের উপর টাকা প্রতি দু' পয়সা ট্যাক্স বসাব। বিনা দর্শনীতে কাউকে ইন্টারভিউ দিব না। বিনা নযরে চাকুরি প্রার্থীর দরখাস্তই গ্রহণ করব না। কি বলছেন আপনি মিঃ ভুঁড়িওয়ালা, আমরা বাঙালিরা, ইচ্ছে করলে এতদিন ব্যবসা করতে পারতাম না? আমরা যারা মসজিদে যাই, নামাজ পড়তে নয়-জুতো চুরি করতে; আমরা যারা মন্দিরে যাই, ঠাকুর পুজতে নয়-পকেট পারতে তারা ইচ্ছে করলে ব্যবসাতে মাড়োয়ারীদের হারাতে পারি না? ইচ্ছে করিনি এতদিন তাইত!

বিস্ময় ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে ভুঁড়িওয়ালা করজোড়ে উভয়কে নমস্কার করে বিদেয় হল। যেতে-যেতে বলল: ধন্য বাঙালিকা মগজ! হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টু-ডে, ইণ্ডিয়া থিংকস্ টু মরো। রাম-রাম বাবুজী, রাম-রাম।

(৩)

আজিজ-নরেনের উদ্যোগে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিখিল বঙ্গ বণিক-সংঘ গঠিত হল। সংঘের প্রথম বৈঠকে বাঙালি জাতির ব্যবসার মূলনীতি রচিত হল। তাই এই:

১. নিছক ব্যবসার জন্যই ব্যবসা করা হবে না। ধর্ম সেবা, জনসেবা ও দেশ-সেবার নামে ব্যবসা চালান হবে।

২. বিনা-মূলধনে ও বিনা-রিস্কে ব্যবসা করা হবে। যে-সব বাঙালি সরকারি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, অথবা যাঁরা কংগ্রেস মুসলিম লীগ হিন্দু সভা কৃষক প্রজাপার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে ঐ সব পদে বহাল থেকেই বিনা মূলধন ও বিনা রিস্কে ব্যবসা চালান অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে না, বরঞ্চ আরো অধিক সংখ্যায় ব্যবসায়ীকে ঐ সব পদে ঢুকানো হবে।

৩. আচার্যদেব-প্রতিষ্ঠিত খাদি প্রতিষ্ঠানের পবিত্র আদর্শ সামনে রেখে কারবারে মিসলিডিং সাইনবোর্ড দেওয়া হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাইনবোর্ড দিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রিন্টিং বিযনেস করা হবে; মুসলিম লীগের সাইনবোর্ড দিয়ে সামরিক বিভাগের এ্যারোড্রামের কন্ট্রাক্ট নেওয়া হবে; হিন্দু সভার সাইনবোর্ড দিয়ে সৈন্য রিক্রুটিং বিযনেস করা হবে। কৃষক-প্রজার সাইনবোর্ড দিয়ে ব্যাংকিং বিযনেস করা হবে; গো রকষা-কমিটির সাইনবোর্ড দিয়ে চামড়ার বিযনেস করা হবে; হাসপাতালের সাইনবোর্ড দিয়ে রোগীর পথ্য ও ওষুধ মেরে দিয়ে চাল-ডাল, মাখন-রুটি ও ওষুধ পত্রের বিযনেস করা হবে; ফ্রী কিচেন ক্যানটিন ও লংগর–খানার সাইনবোর্ড দিয়ে দানের চাল-ডাল উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হবে; সৎকার-সমিতি ও জানাজা-কমিটির সাইনবোর্ড দিয়ে শ্মশানের কাঠ ও কাফনের কাপড় বিক্রি করা হবে। শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কয়টি বিযনেসের নামোল্লেখ করা গেল। বাকিগুলোর কথা সংঘের মেম্বরগণ ইশারায় বুঝে নেবেন। বুদ্ধির স্থূলতাহেতু যে-সব মেম্বর ইশারায় বুঝবেন না তাঁরা দশ টাকা দর্শনী দিয়ে সংঘের সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন; মৌখিক উপদেশ দেওয়া হবে।

এর ফল যা হল, তা কেহ ভাবতে পারে নি। কেরানির জাত বাঙালি রাতারাতি ব্যবসায়ীর জাতে পরিণত হল। অফিস-আদালত, স্কুলে-কলেজে, মন্দিরে-মসজিদে, মঠে দরগায়, হাসপাতালে-এতিমখানায়, বাড়িতে-বাজারে, হাটে-মাঠে, রাস্তায়-ঘাটে,

ঘরে-বাইরে ব্যবসার বিপুল বন্যা প্রবাহিত হল। বিনা-লাভে কেউ কোনো কাজ করে না। টাকা ছাড়া কেউ কোন কথা বলে না। ওযির-নাযির পাত্র-মিত্র কেউ বিনাভোটে মোলাকাত দেন না। বিনা নযরে মেম্বররা ভোটারদের সঙ্গে দেখা করেন না, বিনা দর্শনীতে ডাক্তার হাসপাতালে রোগী ভর্তি করেন না। বিনা দক্ষিণায় হেড মাস্টার স্কুলে ছাত্র ভর্তি করেন না; বিনা তদবিরে গাড়ির টিকেট পাওয়া যায় না। এমনকি ডাক-টিকেটও না। 'পান খাওয়ার' ব্যবস্থা না করলে চাকরি তো দূরের কথা নমিনেশনও পাওয়া যায় না। গতিক ক্রমে এমন দাঁড়াল যে, অগ্রিম গহনা-শাড়ির ওয়াদা না করলে স্ত্রী স্বামীকে বিছানায় উঠতে দেয় না। লাটিম, ঘুড্ডি ও ট্রাইসাইকেলের প্রতিশ্রুতি না দিলে ছয় বছরের শিশু পর্যন্ত পড়াশোনা করতে চায় না। বকশিসের দাবি অগ্রিম স্বীকার না করলে রিকশা বা ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

বাঙালি জাতির নয়া উদ্যমের এই সায়েন্টিফিক বিযিনেসের চোটে তাদের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক ভাল হয়ে গেল; তাতে দেশে খোরাক-পোশাকের দাম চড়ে গেল। সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আইন করলেন। বাজার থেকে চাল-কাপড় পালিয়ে গেল। সরকার চুরি রুখবার জন্য পাহারাদার বসালেন। কিন্তু বেড়াই ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলল।

ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ হল! বাঙালির ব্যবসা-ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হল। রিলিফ কমিটি, সেবাসমিতি, হাসপাতাল, ফ্রিকিচেন, সৎকার-সমিতি ও জানাজা-আঞ্জুমান লাখে-লাখে প্রতিষ্ঠিত হল। মৃত্যু-সংখ্যাও কাজেই লাফিয়ে বেড়ে যেতে লাগল।

সরকার ভাবনায় পড়লেন। বিদেশ থেকে গাড়ি-গাড়ি চাল-ডাল ও থলে-থলে টাকা-পয়সা আনতে লাগলেন। কিন্তু ও-সব বাংলার সরহদ্দে এসেই কর্পূরের মতো উবে যেতে লাগল। কারণ নিখিল বঙ্গ বণিক-সংঘের মেম্বররা সংঘের তরিকা অনুসারে ঐ সব মালের ছাড়পত্র যোগাড় করে যেতে লাগলেন।

কিছুতেই কিছু হল না। বাঙালি জাতির ব্যবসায়িক উন্নতির পথে বাধা দেওয়ার সমস্ত সরকারি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। বহু বাঙালি দরিদ্র কেরানি, ব্রিফলেস উকিল ও হাতুড়ে ডাক্তারের ব্যাংক ব্যালেন্স ফেঁপে উঠল। এইভাবে বাংলার ন্যাশনাল ক্যাপিটেল গড়ে উঠল।

কিন্তু বাঙালি অভুক্ত থেকে গেল। অনাহারে লাখ-লাখ বাঙালি রাস্তায় পড়ে মরতে লাগল রাস্তায় পড়ে মরতে যাদের এক সপ্তাহ লাগছিল, নরেনের হাসপাতালে ঢুকে তারাই এক দিনের মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে লাগল। কারণ নরেনের হাসপাতালে সরকারের দেওয়া ইনজেকশন, ঔষধ, গ্লুকোজ, দুধ-বার্লি ও আনারস-বেদানার গাড়ি হাসপাতালের সামনের গেট দিয়ে ঢুকে পিছনের গেট দিয়ে বের হয়ে দোকানে চলে যেতে লাগল। নরেন তার বদলে রোগীদের ঔষধের নামে গংগার পানি দিতে এবং পথ্যের নামে বাজরার জাউ, ভাতের ফ্যান ও বাতাবিলেবুর খোসা খাওয়াতে লাগল। ফলে দৈনিক হাজার-হাজার বাঙালি নরেনের হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে স্বর্গে

যাওয়ার পথে আজিজের পরিচালিত সৎকার সমিতি ও জানাজা আঞ্জুমানের লরিতে চড়তে লাগল। আজিজের সুশিক্ষিত শিষ্য-সাগরিদরা লরি-লরি মৃতদেহ ময়লা ঢালার মতো গংগায় ঢেলে এসে মাথা পিছু পাঁচ টাকা পোড়াই খরচা ও সাড়ে পাঁচ টাকা দাফন খরচা বিল করতে লাগল।

আজিজ নরেনের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর সব বাঙালি অনাহারে মরে গেল।

লক্ষকোটি লোকের মৃতদেহ পড়ে প্রথমে গংগার পানি ও শেষে বঙ্গোপসাগরের পানি নষ্ট হয়ে গেল। তাতে পলতার কলের পানিও স্বভাবতঃই বিষাক্ত হয়ে গেল। সে পানি খেয়ে গোষ্ঠি শুদ্ধ নরেন আজিজও অবশেষে মারা গেল।

বাঙালির মতো একটা ঐতিহাসিক জাত এইভাবে নিপাত হল।

হারাধনের ছয় পুত্র মারা যাওয়ায় সপ্তম পুত্র ভেউ-ভেউ করে কেঁদে বনে গিয়েছিল। সে হয়ত আজও বেঁচে আছে, কিম্বা বেঁচে নেই। বেঁচে সে থাক আর নাই থাক, হারাধনের ছয় ছেলের জন্য কাঁদবার অন্ততঃ একটি লোক ছিল।

কিন্তু বাঙালি জাতির জন্য কাঁদবার কেউ থাকল না।

(৪)

পরকাল।

মহাবিচারের দিন। হাশরের ময়দান।

মহাবিচারক আল্লার আরশ থেকে হুকুম হল: বাঙালি জাতির সব লোক দুজখে যাবে; কারণ এরা তেজারতি করে গোটা জাতটাই ধ্বংস করেছিল এবং তাতে আমার সৃষ্টির এক অংশ দুনিয়া থেকে লোপ পেয়েছিল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে বললেন: ন্যায়ের অবতার যে মহাপ্রভু, একের দোষে তুমি দশজনকে সাজাদিয়ে ন্যায়ের মর্যাদা নষ্ট করতে পার না। কয়েকজন লোক ব্যবসা করে গোটা বাঙালি জাতিকে মেরে ফেলেছিল। ঐ কয়জনকে তুমি যে কোনো সাজা দিতে পার; কিন্তু যারা অনাহারে প্রাণ দিল, ঐ মযলুমদের তুমি সাজা দিচ্ছ কোন যুক্তিতে?

আরশ থেকে হুকুম হল: যুক্তি তোমারই হে কবি, তুমি নিজের কবিতার কথা স্মরণ কর:

> অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
> তব ঘৃণা দোঁহে যেন সমভাবে দহে।

কবিবর লজ্জায় বসে পড়লেন।

এইবার দাঁড়ালেন বিখ্যাত আইনজীবী ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। তিনি বললেন: বাঙালি জাতির কোনো অপরাধ নেই, মিঃ লর্ড। তারা খুশী খোশালেতে কেরানিগিরি ও

চাপরাশিগিরি করেই খাচ্ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই যত গোলমাল বাধান। তিনিই ত গিয়ে তাদেরে তেজারতিতে কুমতি দেন। শাস্তি যদি কারো পেতে হয়, তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পাওয়া উচিত।

আরশ থেকে নেদা এল: ডাঃ ঘোষ ঠিক কথাই বলেছেন। বেঁধে আন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে।

ফেরেশতারা ছুটলেন আচার্যদেবকে ধরে আনতে।

আচার্যদেব নিশ্চিন্ত মনে বেহেশতের একবাটি শরাবনতহুরা নিয়ে দুজখের আগুনে তাই জ্বাল করে অক্সিজেন-হাইড্রোজেনের খেলা দেখছিলেন। এমন সময় ফেরেশতারা তাঁকে ধরে হাতে-পায়ে টেনে-হেঁচড়িয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে এলেন।

আরশ থেকে হুকুম হল। আচার্যদেবকে দুজখে নিয়ে যাও।

দুনিয়ায় যিনি সকলের সংকট ত্রাণ করে বেড়িয়েছেন তিনিই আজ নিজে এমন সংকটে পড়লেন দেখে হাশরে জমায়েত জনতা হায়-হায় করে উঠল। কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না দেখে বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল হক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন: আচার্যদেব আমার গুরু মশায়। তাঁর হয়ে আমি একটা কথা না বলে পারছি না ইওর অনার। তিনি যে বাঙালি জাতকে তেজারতি শেখাতে গিয়েছিলেন তা হুজুর পাক বারিতালারই হুকুমে। হুজুরের বিনা হুকুমে গাছের পাতাও নড়ে না। কাজেই–

আরশ থেকে এবার নেদা হল: হক সাহেব হক কথাই বলেছেন। আমি ইনসাফের মালিক। বেঈনসাফ আমি করতে পারি না। বাঙালি জাতকে দুজখের আগুন থেকেই রেহাই দেওয়া হল। বেহেশতেই তাদের জায়গা দেওয়া হবে। কিন্তু বেহেশতে তাদের কোনো শরাফৎ দেওয়া হবে না। তারা শুধু বেহেশতের কেরানিগিরি ও চাপরাশিগিরি করবে। এই আমার রায়।

তাই হল।

বাঙালি জাত বেহেশতের কেরানি ও চাপরাশীতে বহাল হল।

খোদার দরবারে আবার এন্টি-কোরাপশান ট্রাইব্যুনাল বসল। অভিযোগ। বেহেশতের মেওয়া ও শরবৎ পাওয়া যাচ্ছে না। সাপ্লাই বিভাগে চুরি হচ্ছে। বহু বেহেশতী দুজখে ও বহু দুজখী বেহেশতে ঢুকে পড়েছে।

ফেরেশতারা এক জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি কমিশন বসিয়েছিলেন। তার রির্পোট ও ট্রাইব্যুনালের সামনে পেশ করা হয়েছে। সে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাঙালি কেরানি চাপরাশীদের যোগাযোগ বেহেশতের বহু পারমিট দুজখীদের কাছে বিক্রি হয়েছে। বহু গেটপাশ দুজখীদের হস্তগত হয়েছে। তাতেই বহু দুজখী বেহেশতে ঢুকে পড়েছে। বেহেশতের বহু মেওয়া ও শরবত পিছনের দরজা দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট দরে দুজখে চলে যাচ্ছে।

আচার্যদেব নিশ্চিন্ত মনে বেহেশতের শরাবনতহুরা নিয়ে.......

সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে ট্রাইব্যুনাল রায় দিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা আরশ থেকে হুকুম করলেন: সমস্ত বাঙালিকে বেহেশতের চাকুরি থেকে ডিসমিস করে হাবিয়া দুজখে ফেলে দাও। তারপর হাবিয়া দুজখের উপর মাটিচাপা দিয়ে দুনিয়া-আসমান থেকে বাঙালি জাতির নাম মুছে ফেল

সমস্ত বাঙালি হায় হায় করে উঠল! শেষবারের মতো চেষ্টা করতে গিয়ে মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার বললেন: হে সদাপ্রভু, সমস্ত দোষ তোমাদের। তোমার দয়ার দাবি আমরা আর করতে পারি না বেহেশতের আশাও আমরা করি না! কিন্তু কেরানী চাপরাশীর জাত আমরা কেরানিচাপরাশীগিরি ছাড়া বাঁচব না। আমাদের তুমি দয়া করে দুজখের কেরানি-চাপরাশী করে দাও। সেখানে তো বিযিনেস করার মতো কোন জিনিস নেই।

আরশ থেকে নেদা হল। তেজারত্তি তোমরা যা শিখেছ, তাতে দুজখের চাকরি দিয়েও তোমাদের আর বিশ্বাস নেই। ফেরেশতাগণ আমার হুকুম তামিল কর—এদের হাবিয়া দুজখে মাটিচাপা দাও। এবং—

ইনসাফের মালিক একটু থেমে কঠোর ভাষায় আবার বললেন: হা আরেকটা কথা। বাঙালি জাত যেখানে সেখানে বাস করেছে, হাইজিনিক মেযার হিসেবে সে-সব জায়গায় বেশ করে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দাও।

১০ আশ্বিন—১৩৫০

(১)

শহীদ 'সম্মানের' সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ডিপ্লোমা লইয়া বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু চাকুরি যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিল না। কারণ অনেক চেষ্টা করিয়াও মন্ত্রীদের কারো সংগেই সে কোন আত্মীয়তা প্রমাণ করতে পারিল না।

চাকুরির বয়স তার পার হইয়া গেল।

অগত্যা সে নিজেই মন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতিতে যোগ দিবে মনস্থ করিল। কারণ সে দেখিল, চাকুরি পাওয়ার চেয়ে মন্ত্রিত্ব পাওয়া অনেক সহজ।

প্রথম চোটে সে স্বভাবতঃই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে যোগ দিল।

কিন্তু কিছুদিন কংগ্রেস করিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, হিন্দুরা বড় সাম্প্রদায়িক। মুসলমানদের পক্ষে সেখানে শাইন করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বড় জোর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও এ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি পর্যন্ত। শহীদের আশংকা হইল, তাতে মন্ত্রিত্বের বেলাতেও হয়ত তাকে 'দ্বিতীয় বেহালা' হইয়াই থাকিতে হইবে। সে ক্লাসেও কোন দিন দ্বিতীয় হয় নাই। রাজনীতিতেও সে দ্বিতীয় হইবে না। সে চায় পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ।

শহীদ কংগ্রেস ছাড়িয়া মুসলমানদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে যোগ দিল। লীগে যোগ দিয়ে সে নিজের বাড়িতে ফিরিয়া আসা মতই একটা আত্মীয়তার আবহাওয়া অনুভব করিল, মনে করিল এইবার সে পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পাইবে।

কিন্তু শহীদ হতাশ হইল। দেখিল, এখানে উর্দু ও শরাফতের বড্ড বাড়াবাড়ি। সভা-সমিতিতে অনেক কথাই তার বলিবার থাকে, তার চোখের সামনে অনেক অন্যায় কথা কওয়া হয় এবং ভুল সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু সে মনের কথা বলিতে পারে না। ইংরাজী বলিলে লীগ নেতারা আপত্তি করেন: বাংলা বলিলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে গল্প আরম্ভ করেন; আর উর্দু বলিলে তাঁরা হো হো করিয়া হাসিতে থাকেন।

কাজেই শহীদ লীগের সভা সমিতিতেও শাইন করিতে পারিল না। পদমর্যাদাও কাজেই লাভ করিতে পারিল না।

শহীদ শেষ পর্যন্ত লীগও ছাড়িয়া দিল।

'জাতীয়তার' নামে বর্ণহিন্দুরা এবং 'মুসলিম সংহতির' নামে বিদেশী মুসলমানরা বাংলার মুসলমানদের উপর নেতৃত্ব করিতেছে দেখিয়া শহীদের মন রাগে গিরগির করিতে লাগিল।

সে বাংলায় স্বাধীন মুসলিম জনমত গঠনের জন্য সংবাদ-পত্র বাহির করিল। মনে করিল: এইবার সে ঠিক পথ ধরিয়াছে। জয় তার হইবেই।

কিন্তু আলেম সম্প্রদায় ফতোয়া দিলেন: যেহেতু একটি সংবাদ-পত্র ইতিপূর্ব হইতেই লীগ সমর্থন করিতেছে এবং যেহেতু মুসলমান সমাজে একাধিক সংবাদ-পত্র বাহির হইলে তার ফল একাধিক মতবাদ সৃষ্টি হইবে এবং তাতে 'মুসলিম-সংহতি' নষ্ট হইবার আশংকা আছে। অতএব কোন মুসলমান নতুন কোন কাগজ বাহির করিয়া মুসলিম সমাজে ভিন্ন গোঠ তৈয়ার করিতে পারিবে না। যে করিবে ইহকালে তার বিবি তালাক হইবে এবং পরকালে সে পোলসিরাত পার হইতে পারিবে না।

শহীদ বিবাহ করে নাই, সুতরাং বিবি তালাক হইবার আশংকা তার ছিল না। কিন্তু দুষ্ট কারণে তাকে কাগজ বন্ধ করিতে হইল। প্রথমতঃ পোলসিরাত পার হওয়া তো দুদিন পরের কথা, লীগ ভলান্টিয়ারদের উৎপাতে ইহকালে তার নির্বাচন-পোল পার হওয়াই অসম্ভব হইল; দ্বিতীয়তঃ গ্রাহকের অভাব হইল।

অগত্যা কাগজ বন্ধ করিয়া শহীদ অতঃপর কি করিবে ভাবিতে লাগিল। বহু চিন্তার পর সে দুইটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। প্রথমতঃ নিজস্ব পার্টি তাকে একটি করিতেই হইবে, কারণ মন্ত্রী তাকে হইতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ এমন পার্টি করিতে হইবে, যাতে কংগ্রেসও বাধা দিবে না, মুসলিম লীগও বাধা দিবে না।

সুতরাং অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ও জাতীয়তার আদর্শে, অথচ পাকিস্তানী আবহাওয়ায় ও ইসলামী কায়দায় কি একটা অপূর্ব প্রতিষ্ঠান খাড়া করা যায়, শহীদ সে বিষয়ে ঘোরতর নিদ্রাহীন চিন্তা করিল। চিন্তা করিতে করিতে সে বিপরীত সত্যের সম্মুখীন হইল। সে বুঝিতে পারিল, এমন একটা কিছু তার করিতে হইবে যাতে জাতীয়তাও থাকিবে; পাকিস্তানও থাকিবে সাম্প্রদায়িকতাও থাকিবে; হিন্দুয়ানিও থাকিবে মুসলমানিও থাকিবে; পাকিস্তানও থাকিবে অখণ্ড ভারতও থাকিবে! চিন্তার অরণ্য-পথে চলিতে চলিতে সে বিভিন্ন ভাব-গুহায় প্রবেশ করিয়া এই জ্ঞান লাভ করিল যে তার স্কীম অসাম্প্রদায়িক হইলে চলিবে না। কারণ অসাম্প্রদায়িক মানে না-হিন্দু, না-মুসলমান। ওটা নেগেটিভ। নেগেটিভ মতবাদের চেয়ে পজিটিভ মতবাদগণ চিত্ত ঝটপট জয় করিতে পারিবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শহীদ খুশী হইল; তার বুকটা অনেক হাল্কা হইল।

কিন্তু আসল মুসকিল হইল বিষয় নির্বাচনে। সম্ভব ও সম্ভাবিত, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল বিষয়বস্তু ও কর্মক্ষেত্রে সে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিল; বিস্ময় ও বেদনায় সে

উপলব্ধি করিল যে, তার চেয়ে অনেক বেশি দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান লোক এদেশে আছে; কারণ ঐ-সব বিষয় এবং ক্ষেত্রে অনেক আগেই সমিতি হইয়া গিয়াছে। সে জানিতে পারিল: হিন্দু সভা মুসলিম লীগ বা কংগ্রেসই একমাত্র সমিতি নয়। সে দেখিল: কৃষকপ্রজা স্বাধীন প্রজা ঠিকাপ্রজা উঠ্ প্রজা বস্প্রজা শ্রমিক ও সরকারি কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া বেসরকারী বেকার পর্যন্ত সকলেরই এক-একটা সমিতি আছে। ব্যবসায়ী, ব্যবহারী দোকানদার খরিদ্দার, হকার, বেকার, গ্রন্থাকার-পাঠক, শিক্ষক-ছাত্র, যুবক-বৃদ্ধ, প্রগতিশীল, দুর্গতিশীল, ব্রতচারী-বিব্রতচারী ইত্যাদি সকলেরই যখন সমিতি আছে, তখন শহীদ কি করিবে?

শহীদ চিন্তায় চিন্তায় পাগল হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু ভাবনায় তার শেষ হইল না। অথচ এদিকে তার তহবিল শেষ হইয়া গেল। কাজেই খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। মেসে বাবুর্চিখানার এবং মস্তিষ্কে চিন্তার দরজা রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সে রাস্তায় বাহির হইল। রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে যেখানে যা দেখিল, কল্পনায় তারই একটা সমিতি স্থাপনের সংকল্প করিল। সে একটি দর্জি সমিতির সম্ভাবনা দেখিল। সে হাফ শার্ট কেনা ফেলিয়া রাখিয়া কল্পিত দর্জি-সমিতির কনস্টিটিউশন রচনার জন্য ফিরিয়া বাসায় ছুটিল। রাস্তার মোড় ঘুরিবার সময় হঠাৎ এক দোতলার রেলিং-এ প্রায় পনের হাত লম্বা সাইনবোর্ডে লেখা দেখিল। 'নিখিল দর্জি সমিতি।'

শহীদ হতাশ হইল।

তারপর ক্লান্ত দেহে রেল-স্টেশনের ওয়েটিং শেডে বিশ্রাম করিতে করিতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী সমিতি গঠনের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা দেখিতে পাইল। সে অত্যন্ত অকস্মাৎ সঙ্গীদিগকে চমকাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া স্টেশন হইতে বাহির হইল। কল্পিত সমিতির কনস্টিটিউশন রচনার জন্য রাস্তার এক মুদির দোকান হইতে দুই পয়সার কাগজ কিনিয়া বাসায় ফিরিল।

আলো, কলম ও দোয়াতের প্রাথমিক আয়োজন সারিয়া সে যেই কাগজের মোড়কটি খুলিতে গেল, অমনি মোড়কের উপর নজর পড়িল। মুদি যে কাগজের টুকরা দিয়া কাগজগুলি মোড়াইয়া দিয়াছিল, সেটি ছিল একটি পুরান সংবাদ-পত্রের টুকরা। তাতে একটি বড় হেডিং এর দিকে শহীদের নজর পড়িল। সে বিস্ময়-নৈরাশ্যের সহিত দেখিল: প্রায় ছয় মাস আগে অল-ইণ্ডিয়া থার্ডক্লাশ রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার্স কনফারেন্সের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের একজন নাইট সদস্য উক্ত সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

শহীদ রাগে কাঁদিয়া ফেলিল। সে নতুন কেনা কাগজগুলি টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

তারপর শহীদ বাজারে-বাজারে ঘুরিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিল যে ধোপা, নাপিত, ধাংগর, মেথর ও রাজমিস্ত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া মাছ, গোশত, আলু, পটল, তামাক ও মুরগীর আণ্ডা ব্যবসায়ী পর্যন্ত সকলেরই সমিতি আছে।

শহীদ শোপেন্হাওয়ারের মতো হতাশ হইল। রাজনীতি ত্যাগ করিয়া সে লটারি টিকিট কেনা ও ক্রসওয়ার্ড খেলা আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিল। কিন্তু টাকা-পয়সার অভাবে সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিতে পারিল না।

এমন সময় শহীদ ঘটনাচক্রে অর্থাৎ অন্য বাজে কাজের অভাবে তিলক-রসুল-স্মৃতি বার্ষিকীর এক যুক্ত সভায় উপস্থিত হইল। এইখানেই তার মাথায় এক ফন্দি জুটিল। এ ফন্দি নির্ঘাত। এর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, শহীদ সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইল।

নিজের বুদ্ধিতে শহীদের শ্রদ্ধা বাড়িল। আনন্দে তার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

শেষ পর্যন্ত অল-ইণ্ডিয়া কনডোলেন্স কংগ্রেস স্থাপনের এক সংবাদ খবরের কাগজে ঘোষিত হইল। একটি অনুষ্ঠান-সভা আহূত হইল। আহবায়ক শহীদ।

কিন্তু সভায় বড় কেহ আসিল না।

টাকাওয়ালা এক বন্ধুর সাহায্যে দ্বিতীয়বার সভা ডাকা হইল! সে সভার হালকা নাশতার ব্যবস্থার কথা ও প্লানচেটে পরলোকগত নেতাদের আত্মার আমদানির কথা ঘোষিত হইল।

এইবার সভা লোকে লোকারণ্য হইল। বহু খাটিয়া-খুটিয়া শহীদ কনস্টিটিউশনও একটি খাড়া করিয়া ফেলিল।

(২)

প্লানচেট ও হালকা নাশতার জন্যই যে সভায় অত লোক হইয়াছে, আলোচ্য বিষয় তাড়াতাড়ি শেষ করিবার তাগিদ হইতেই শহীদ তা বুঝিতে পারিল। সে তার জন্য তৈরিও ছিল। তার কর্ম-জীবনের এটাই শেষ এক্‌স্‌পেরিমেন্ট। এর সাফল্য নিষ্ফলতার উপর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কাজেই বন্ধুর কাছে ঘড়ি বন্ধক দিয়া সে হালকা নাশতার আয়োজন করিয়াছে।

শহীদ সক্রিয় রাজনীতির অভিজ্ঞ ছাত্র। সমস্ত আয়োজনই সে ঠিক মতো করিয়াছিল। নিজের অনুগত ও হিতৈষী বন্ধু মজিদকে সে আগেই সভাপতির চেয়ারের অতি নিকটে বসাইয়া রাখিয়াছিল। প্রথম সুযোগেই তাকে সভাপতি প্রস্তাব করিয়া ফেলিল। মজিদও গুৎ-পাতা খেঁক্‌শিয়ালের মতো একলম্ফ লাফাইয়াই সভাপতির আসনে বসিল। শহীদ নিজেই করতালি দিয়ে সভাপতিকে অভিনন্দন জানাইল। দেখাদেখি অথবা নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে আরো অনেকে করতালি দিল। মাননীয় সভাপতি মহোদয় সভার উদ্যোক্তা শহীদ সাহেবকে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য আহবান করিলেন। শহীদ মজিদকে পূর্ব হইতেই ইহা শিখাইয়া রাখিয়াছিল।

সভাপতির আহবানে শহীদ বক্তৃতা আরম্ভ করিল: মাননীয় সভাপতি ও সমবেত ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি।

শহীদ প্রথমে নিম্নসুরে এবং ক্রমে সুর চড়াইয়া শেষ দিকে গলা কাঁপাইয়া মাঝখানে একবার বক্তৃতা থামাইয়া রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া প্রায় আধঘন্টাব্যাপী

উচ্ছ্বসিত বক্তৃতায় যা বলিল তার সারমর্ম এই: সকল বিষয় ও সকল স্বার্থের জন্যই এক একটি সংঘ-সমিতি আছে, কিন্তু এক অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের জন্য, একটি মহান পবিত্র ও গুরুতর দায়িত্ব পালনের জন্য, বলিতে গেলে একটি ধর্মকার্যের জন্য, কোন সংঘ-সমিতি নাই।

এই সভা-সর্বস্ব জাতির মধ্যে আজিও একটা বিষয়ের সভা-সমিতি হয় নাই, একথা শ্রোতৃমণ্ডলী সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না: তারপর সে বিষয়টা অতিশয় জরুরী, এমন কি প্রায় ধর্ম-কার্যের শামিল, একথা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে ও কৌতূহলে পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। হরিসভা নিমাই-সংঘ, আঞ্জুমান-ই-তবলিগ-উল-ইসলাম দেব-পাঠচক্র কোরান-প্রচার সমিতি ও নামায-কমিটির কর্মকর্তারা অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। কিন্তু সাধারণ দর্শকেরা কৌতূহলে বকগ্রীব হইয়া শহীদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সভায় সুই-পড়া নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

শহীদ বলিতে লাগিল: নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারের জন্যও আমাদের সংঘ সমিতি আছে; কিন্তু আমাদের যে পূজনীয় নেতৃবৃন্দ ও মনীষী মহাপুরুষেরা দেশ ও সমাজের জন্য তিলে-তিলে আত্মদান করিয়া পরলোকে চলিয়া যান, তাঁদের মৃত্যুতে সংঘবদ্ধভাবে শোক প্রকাশের জন্য কোন কনডোলেন্স কমিটি নাই। ভাবুন একবার ভ্রাতৃগণ, তাঁদের নিমতলায় পোড়াইবার জন্য সৎকার সমিতি আছে; তাদের গোব্‌রায় গাড়িবার জন্য আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল ইসলাম আছে। অথচ তাঁদের মৃত্যুতে সংঘবদ্ধভাবে একবিন্দু চোখের পানি ফেলিবার জন্য একটা শোক প্রকাশ সমিতি নাই (এইখানে শহীদ রুমালে চোখ মুছিল)। এটা কত বড় অকৃতজ্ঞতা, কতবড় বেঈমানী। (এইখানে শহীদের চোখে-মুখে-ঘৃণা-বিতৃষ্ণার আগুন জ্বলিয়া উঠিল)।

সমস্ত সভা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শহীদের কথা হা করিয়া গিলিতে লাগিল। শহীদ বলিয়া যাইতে লাগিল: তাই আমরা কতিপয় তরুণ নিঃস্বার্থ কর্মী অল-ইণ্ডিয়া কন্‌ডোলেন্স কংগ্রেস অর্থাৎ নিখিল ভারত শোক প্রকাশ সমিতি গঠন করার মনস্থ করিয়াছি। আজকাল অনেকেই অনেক সংঘ-সমিতি গঠন করিতেছে। তাদের সকলেরই কোন না কোন মতলব আছে। কিন্তু আমরা, আমাদের যে কোন মতলব নাই আমাদের উদ্দেশ্য হইতেই তা সুস্পষ্ট! আমরা জীবন্ত লোক লইয়া কারবার করিব না, শুধু মৃত ব্যক্তিদের লইয়াই কারবার করিব। কাজেই আমাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকিতে পারে না। আসুন ভ্রাতৃগণ, মানবতার নামে মনীষার মর্যাদার নামে স্মৃতিপূজার নামে ইত্যাদি–বলিয়া শহীদ যেভাবে বক্তৃতার উপসংহার করিল, তাতে মুহুর্মুহ করতালিও হর্ষধ্বনি হইল।

তারপর শহীদ কোটের বুক পকেট হইতে একখন্ড কাগজ বাহির করিয়া প্রস্তাবিত সমিতির আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়মাবলী ও অস্থায়ী কমিটির সদস্যগণের নাম পাঠ করিল।

তাতে মজিদ সভাপতি, স্বয়ং শহীদ সেক্রেটারি ও ক্যাশিয়ার ইত্যাদি প্রস্তাব ছাড়া নিম্নলিখিত নিয়মাবলী থাকল:

১. এই সমিতি প্রকৃত গুণী, মনীষী, দেশসেবী জনহিতৈষী লোকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবে।

২. যাতে অর্থবিত্তশালী অযোগ্য লোকদের জন্য কোন কনডোলেন্স না হয় এই সমিতি সে ব্যবস্থা করিবে।

৩. অনেক অর্থবিত্তশালী লোকের আত্মীয়-স্বজন নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়ের নামে ঢাক ঢোল পিটাইবার উদ্দেশ্য নিজেরাই অর্থব্যয় করিয়া কৃত্রিম শোক সভার আয়োজন করে এবং তাতে প্রকৃত গুণী লোকের স্বার্থহানি হইয়া থাকে। এই সব অনাচার করাপশন ও এডালটারেশন দূর করিবার জন্য এই সমিতি শোক প্রকাশের একমাত্র অধিকারীরূপে নিজেদের অধিকার পেটেন্ট রেজিস্টারি করিবে।

৪. যাতে স্বার্থান্বেষী প্রতারকরা জনসাধারণের নামে অযোগ্য লোকদের জন্য শোক প্রকাশ না করিতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এই সমিতি একদল সুশিক্ষিত শক্তিশালী ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিবে।

৫. রুগ্ন আহত ও অন্যান্য কারণে মৃত্যু সম্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যে কে কে কনডোলেন্সের সম্মান পাইবার অধিকারী তা জানিবার জন্য এবং অধিকারী হইলে কে কতটুকু কনডোলেন্স পাইতে পারেন তার ক্রম নির্ধারণের জন্য এই সমিতির শাখা সমিতির কর্মকর্তারা সেচ্ছাসেবকবাহিনীর মারফত ঐসব মৃত্যু-সম্ভবদের সৎ ও অসৎ কার্যের ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ সংগ্রহ করিবে।

৬. শোক প্রকাশ কার্য যাতে অব্যাহতভাবে চলিতে পারে, গুণী লোকের জন্য যথোপযুক্ত শোক প্রকাশের পুণ্যকার্য ও পবিত্র অধিকার হইতে দেশবাসী যাতে বঞ্চিত না হয়, সে উদ্দেশ্যে এই সমিতি যথেষ্ট সংখ্যক গুণীলোকের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যে কোন শান্তিপূর্ণ ও অহিংস উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে। তবে এই সমিতির কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না। কারণ সম্মান দেওয়াই এদের নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য, সম্মান পাওয়া এদের উদ্দেশ্য নয়।

শহীদের বক্তৃতা, সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী শুনিয়া প্রস্তাবিত সমিতির প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হইলেন। চাঁদা দিতে হইবে না শুনিয়া অনেকেই মেম্বর হইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। শহীদ তাঁদের নাম ঠিকানা লিখিয়া লইল। সভায় বিপুল উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল।

সমস্ত প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

সভাপতি সাহেব উপসংহারে এই সভার উদ্যোক্তা ও শোক-সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা শহীদ সাহেবকে সমস্ত সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি শহীদ সাহেবকে নবযুগের অগ্রদূত চিন্তানায়ক মনীষী ও নিঃস্বার্থ

দেশসেবী বলিয়া অভিনন্দন জানাইলেন। শোক প্রকাশের নামে দেশময় যে ব্যভিচার ও অনাচার চলিতেছে, এই সব অনাচার দূরীকরণের দ্বারা দেশে প্রকৃত গুণীর আদরের ব্যবস্থা না করিলে দেশের যে মুক্তি নাই, এ সত্য শহীদ সাহেবই প্রথম আবিষ্কার করিলেন বলিয়া মাননীয় সভাপতি শহীদ সাহেবের সহিত সভার মধ্যেই কর-কম্পন করিলেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর হালকা নাশতা খাইতে সভা ভঙ্গ হইল। অত রাত্রে প্লানচেট শুনিবার ধৈর্য আর কারো থাকিল না।

পরদিন সকালে খবরের কাগজে শহীদের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

(৩)

অল-ইণ্ডিয়া কনডোলেন্স কংগ্রেসের চতুর্থ হীরক জুবিলি উৎসব।

মেম্বর ছাড়াও বাইরের অনেককেই দাওয়াত করা হইয়াছে। মেম্বররা সবাই শোক-চিহ্ন স্বরূপ বাম বাহুতে ছাতার কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া বাঁধিয়াছেন। তাতে বোঝা যায়, দর্শকের চেয়ে মেম্বর অনেক বেশি।

সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সমিতির সেক্রেটারি মিঃ ওয়াহিদ পঁচিশ-সালা রির্পোট পাঠ করিতেছেন।

সেক্রেটারি সাহেব পড়িতেছিলেন: আমার প্রাতস্মরণীয় প্রমাতামহ মরহুম শহীদ সাহেব সার্ধ দুইশত বছর আগে এই পবিত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার পর হইতে তাঁরই অযোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে আমাদের পরিবারই এই প্রতিষ্ঠানের পতাকা বহন করিয়া আসিতেছে (হিয়ার-হিয়ার বলিয়া মেম্বরদের হর্ষধ্বনি)। এই পবিত্র দায়িত্ব বহন করিতে গিয়া আমাদের পরিবার এবং সমিতির কর্মীরা প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন (মারহাবা-মারহাবা)! সত্য বটে, আমার পুণ্যশ্লোক প্রমাতামহের মৃত্যুর পর আমার মাতামহ এবং তাঁরও পরলোকগমনে আমার মাতার ওয়ারিসরূপে পিতৃদেব যেরূপ সাফল্যের সহিত এই সমিতির কাজ চালাইয়া গিয়াছেন আমার অযোগ্য স্কন্দের উপর এই বিপুল দায়িত্ব পড়িবার পর হইতে সেরূপ সাফল্যের সহিত সমিতির কাজ চলিতেছে না।

কিন্তু বন্ধুগণ, সে দোষ আমার বা সমিতির কর্মকর্তাদের নয়। আমার প্রমাতামহ যখন এই প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপন করেন, তখন প্রতি মাসে একবার সমিতির বৈঠক বসিবার এবং রির্পোট পাঠ করিবার নিয়ম ছিল। তার বদলে ক্রমে ষান্মাসিক, বার্ষিক, পাঁচ-সালা, দশসালা হইতে আজ আমরা পঁচিশ-সালা রির্পোট পাঠ করার নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছি। আগে আগে মাসিক-বার্ষিক রিপোর্ট অন্ততঃ দু-চারজন নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইত। কিন্তু আপনারা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, আজকার পঁচিশ-সালা রির্পোট ও একটি শোক সভার রির্পোট দিতে পারিতেছি না।

ইহার কারণ কি? কারণ আপনাদের অজানা নাই। পঁচিশ বছর আগে আমি আমার রিপোর্টে নেতাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছি, আজিও আমি সেই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আগে-আগে নেতারা যেরূপ অল্প বয়সে তাড়াতাড়ি প্রাণত্যাগ করিতেন, আজিকার নেতারা কিছুতেই সে নিয়ম পালন এবং নেতৃত্বের সে ঐতিহ্য রক্ষা করিতেছেন না। আগেকার নেতাদের মধ্যে প্রাণ ছিল, দেশবাসীর প্রতি তাঁদের দরদ ছিল। তাঁদের মধ্যে কায়েমী স্বার্থবোধ ছিল না। সেজন্য তাঁরা যথাসময়ে অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করিতেন। কিন্তু আজিকার নেতাদের মধ্যে নেতৃত্বের কায়েমী স্বার্থবোধ এতই প্রবল যে তাঁরা কিছুতেই মরিতে চান না। এ অবস্থায় শোক-সমিতির কাজ চালানোই একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা এম. কে. গান্ধীর প্রপৌত্র মিঃ ও কে গান্ধী, কায়েদে-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার প্রদৌহিত্র মিঃ আহমদ আলী জিন্না, শেরে-বাংলা মৌঃ এ, কে, ফজলুল হকের প্রদৌহিত্র মিঃ ডি, কে, ফজলুল হক প্রভৃতি নেতারা কিছুতেই মরিতে প্রস্তুত নন (শেম্ শেম্)। ঐ সব পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ ও তাঁহাদের পুত্রপৌত্রগণের ষাট সত্তর বছরের বেশি বাঁচেন নাই।

কিন্তু তাঁহাদের বর্তমান উত্তরাধিকারীগণ সমস্ত ভদ্রতা পারিবারিক ঐতিহ্য জাতীয় কৃষ্টি ও দেশবাসীর স্বার্থের বুকে পদাঘাত করিয়া আশি নব্বই বছর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতেছেন (পুনরায় দ্বিগুণ জোরে শেম্-শেম্)। এখনো তাঁদের মরিবার নামটি নাই।

ইহাতে দুইদিক হইতে দেশে ক্ষতি হইতেছে। একদিকে শোক প্রকাশের উপযুক্ত লোক মোটেই পরলোকমুখী না হওয়ায় শোক-প্রকাশ সমিতি একেবারে বেকার বসিয়া আছে। দেশবাসী গুণীলোকের শোক-মাতম করিতে না পারিয়া গোনাহগার হইতেছে। তাতে দেশবাসী জনসাধারণের উপর খোদার অভিসম্পাৎ পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষ মহামারী লাগিয়াই আছে। তাতে প্রতিদিন দেশের লক্ষ-লক্ষ লোক মরিতেছে। ইহাতে দেশ উজাড় হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কাজের লোক না মরিয়া বাজে লোক বেশি মরিতেছে। ফলে আমরা এমন শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি যে আজ কোন মহাত্মা স্বর্গ গমন করিলে তাঁর শোক-সভার যথেষ্ট সংখ্যক লোক পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে।

অপরদিকে এই সব কায়েমী-স্বার্থী নেতা নেতৃত্বের গদি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকার ফলে তাদের পুত্র-পৌত্রেরা ঠাকুরদাদার বয়সী হইয়াও নেতৃত্বের অপর্চুনিটি পাইতেছেন না।

নেতারা দীর্ঘায়ু হওয়ায় আমাদের ক্রমবিকাশমান স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্তির মেয়াদ স্বভাবতঃই লম্বা হইয়া যাইতেছে। অথচ লম্বা হওয়ার কোন কারণ ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রথম গান্ধীর সময় দেশবাসী স্বরাজ করিত। তারই আদর্শ ধরিয়া আমরা আজ বিরাজ করিতেছি! কায়েদে-আযম জিন্না সাহেব আমাদিগকে পাকিস্তানের রাস্তা দেখাইয়াছিলেন। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শোক-প্রকাশ-সমিতির কর্মীরা আমরা দেশবাসীকে গোরস্তানের দিকে লইয়া যাইতেছি। আমাদের শেরে-বাংলা প্রথম হক

সাহেব আমাদিগকে ডাল-ভাত ভোজনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁরই আদর্শে সত্য মিথ্যার ডাল-চাউলে খিচুরী রাঁধিতেছি। আমরা কোন দিকে আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছি?

আমরা শাসনকার্যে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারিলে মহামনীষী এমেরি সাহেব আমাদিগকে চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেই উপনিবেশ দিবেন ওয়াদা করিয়াছিলেন। (হিয়ার হিয়ার) কেন আমরা এত অভিনিবেশ করিয়াও উপনিবেশের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারিলাম না? শুধু নেতৃবৃন্দের মন্থর গতি ও ডাইলেটরি ট্যাক্‌টিকসের জন্য (শেম্ শেম্)।

ভ্রাতৃগণ দেশের জনসাধারণের কোন দোষ নাই; তাদের হার্ট খুব সাউণ্ড আছে; বরঞ্চ হাঁপানিতে তাদের হার্টের সাউণ্ড বাড়িয়াই গিয়াছে (হর্ষধ্বনি)। তারা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও বসন্ত-ওলাউঠায় প্রতিদিন লাখে লাখে আত্মত্যাগ করিতেছে (হিয়ার হিয়ার)! ঐ হারে প্রাণত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলে আমরা এক শতাব্দীর মধ্যেই চৌদ্দপুরুষ পার হইতে পারিতাম। কিন্তু পারিলেন না শুধু নেতাদের দীর্ঘসূত্রতার জন্য।

দেশের জন্য তাঁরা আত্মহত্যা করে দূরে থাকুক, গুরুতর অসুখ-বিসুখেও তাঁরা মরিতে চান না। বরঞ্চ তাঁরা স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য ছাগলের দুধ, মকরধ্বজ ও এক্‌শব্যাণ্ডি ইত্যাদি নিত্য-নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিতেছেন। তার উপরেও অতি-সাবধানতারূপে ডাক্তার রায়, ডাক্তার আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ, কবিরাজ গণনাথ প্রভৃতি বড়-বড় ডাক্তার কবিরাজের সার্ভিস বড়-বড় নেতাদের জন্য রিজার্ভ করা হইয়াছে। ফলে নেতাদের মৃত্যু আজ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে (ডাক্তারদের গুলি করুন)! তার উপর গোদের উপর বিষফোড়া। নেতাদের বিশেষ ব্যবহারের জন্য ইদানিং আবার 'কল্পতরু-চিকিৎসা' আবিষ্কৃত হইয়াছে (শেম শেম)।

ভ্রাতৃগণ, শেম্ শেম্ করিয়া আর কোন কাজ হইবে না। আমার প্রাতঃস্মরণীয় প্রপিতামহের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া এই আড়াইটি শতাব্দী আমরা যথেষ্ট শেম শেম করিয়াছি। এবার কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। নেতৃ-পূজার ও নেতৃ-শোকের পবিত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইলে আমাদিগকে ত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আপনাদের এই দীনসেবক দীর্ঘকালের সাধনায় 'কনস্ট্রাকটিভ' ও 'ডেস্ট্রাকটিভ' উভয় প্রকারের দুইটি কর্মপন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। সেই দুইটি কর্মপন্থাই আজ আপনাদের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি।

বন্ধুগণ, আমার প্রথম প্রস্তাব ডেস্ট্রাকটিভ। কারণ ডেস্ট্রাকশন মাস্ট প্রিসিড কনস্ট্রাকশন। সে প্রস্তাব এই যে, আমরা মিঃ গান্ধী, মিঃ জিন্না ও মিঃ হক প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের নিকট একদল প্রতিনিধি পাঠাইব। প্রস্তাবিত ডেপুটেশন এই সব নেতার প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষ মহাত্মাজী কায়েদে-আযম ও শেরে-বাংলার পবিত্র স্মৃতির দোহাই দিয়া এই নেতৃবৃন্দকে দেশবাসীর আত্মিক কল্যাণের খাতিরে অনতিবিলম্বে দেহত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবে। ডেপুটেশন নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজন

বোধ করিলে খাকসার বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে। নেতৃবৃন্দ যদি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে অস্বীকার করিবার মতো অসংগত মনোভাব অবলম্বন করেন, তবে খাকসারি বেলচার সাহায্যে তাহাদিগকে স্বর্গ ও বেহেশ্‌তের পথে পাঠাইয়া দিবার এবং এইভাবে তাঁহাদের প্রতি অপার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার অধিকার দেশবাসীর আছে। নেতারা মরিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কনডোলেন্স গ্রহণে এই যে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন, হইতে পারে এটা তাঁদের বিনয়ের আতিশয্য মাত্র। ভদ্রতা ও বিনয়বশতঃ নেতারা গলায় মালা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেও আমরা যেমন জোর করিয়া তাহাদের গলায় মালা পরাইয়া দেই, তেমনি এবার আমরা তাঁদের মাথায় বেলচার আঘাত হানিব, এইভাবে তাঁদেরে সরাইয়া তাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিব। তাঁদের সম্মান আমরা করিবই (দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি)।

বন্ধুগণ, আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব কনস্ট্রাকটিভ। কারণ কনস্ট্রাকশন মাস্ট ফলো ডেস্ট্রাকশন। যাতে দিন দিন নেতৃ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইয়া শোক প্রকাশ সমিতির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা সংবাদপত্রের সহযোগিতায় অবিরত প্রচারের দ্বারা শোক প্রকাশের উপযুক্ত জনপ্রিয় নেতা তৈরি করিব। এ ব্যাপারে আমরা সমস্ত সংবাদপত্রের বিশেষতঃ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সহায়তা কামনা করিতেছি। যেসব সংবাদপত্র আমাদের নির্দেশ মতো প্রচার করিবেন না, তাদের অফিসেও বেল্‌চা পাঠানো হইবে। তবে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকরা বেলচার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁরা শোক প্রকাশের উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না।

সেক্রেটারির রিপোর্ট পড়া শেষ হইল। চারিদিকে বিপুল হর্ষধ্বনি হইল।

সেক্রেটারির প্রস্তাবিত 'কনস্ট্রাকটিভ ও ডেস্ট্রাকটিভ' কর্মপন্থা দুইটিই জাবেদা প্রস্তাবের আকারে পেশ করা হইল। বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে প্রস্তাব দুইটি বিনা-সংশোধনে গৃহীত হইল।

অনেক রাত্রে 'লিডারানে-কওম মুর্দাবাদ' 'এ. আই. সি. সি. জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে সভার কার্য সমাপ্ত হইল।

(৪)

বোম্বাই শহরে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির নেতৃরক্ষা সাব-কমিটির স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বর হিসাবে মিঃ গান্ধী, মিঃ জিন্না ও মিঃ হক প্রভৃতি নেতারা যুক্তভাবে এ, আই, সি, সি-র ডেপুটেশনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন। নেতৃরক্ষা সাব-কমিটির সভাপতি পণ্ডিত হীরালাল নেহেরু ও সেক্রেটারি ডাঃ ধান্যভি সীতারামায়া খাকসারী বেল্‌চার হাত হইতে নেতৃবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট পুলিশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তথাপি সাবধানের মার নাই হিসাবে মিঃ গান্ধী তাঁর প্রাতঃস্মরণীয় প্রপিতামহ মহাত্মাজীর ছাগলটি, মিঃ জিন্না তাঁর প্রমাতামহ কায়েদে-আযমের

আকসিরের বোতলটি ও মিঃ হক তাঁর প্রমাতামহ শেরে-বাংলার তাবিজের বান্ডিলটি সংগে লইয়া আসিয়াছেন।

মিঃ গান্ধী ...... সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন

বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রতিনিধি-মণ্ডলীর কাপড়-চোপড় সময় আণ্ডারওয়ার তল্লাশি করিবার পর তাঁহাদিগকে বহু ডোর ও হাফডোর পার করিয়া নেতৃবৃন্দের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। প্রতিনিধি-মণ্ডলী খুব যোগ্যতার সহিত নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য, এ. আই. সি. সি-র আদর্শ ও প্রোগ্রাম এবং গত পাঁচিশ-সালা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মর্ম নেতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন।

মিঃ গান্ধীই আগে কথা বলিলেন: বেল্‌চার কথা শুনিয়া বুঝিলাম এ. আই. সি. সি-র কর্মপন্থায় বীরত্ব আছে। কিন্তু দেখিয়া প্রাণে অতিশয় বেদনা-বোধ করিলাম যে, ইহার আদর্শের মধ্যেই হিংসা ও অসত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা স্থূলদৃষ্টিতে যাকে মৃত্যুরূপে দেখি সেটা আসলে মৃত্যু নয়, উহা বস্তুতঃ একস্থান হইতে আরেক স্থানে যাওয়া মাত্র। এ জন্য শোক করিলে তাতে ইহকাল-পরকালের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটাই অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া, এটা ঘটে ভগবানের ইচ্ছায়। ভগবানের কার্যে দুঃখ প্রকাশ করা তাঁরই কার্যের প্রতিবাদ করা মাত্র। এটা ভারতের ঐতিহ্যেরও বিরোধী।

সত্য ও অহিংসারও বিরোধী। অতএব এ. আই. সি. সি-র উদ্দেশ্যের সহিত আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। কাজেই এই সমিতির অনুরোধে আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ আমার পরম পুজ্যপাদ প্রপিতামহ মহাত্মাজী সত্য ও অহিংসার জন্য আমার উপর যে ছাগল প্রতিপালনের ভার দিয়া গিয়াছেন, সে ছাগলের প্রতি কদাচ আমি অবহেলা করিতে পারি না। তবে হাঁ, আমার বন্ধুও ভ্রাতা মিঃ জিন্না ভারতীয় জাতিত্বে ও ঐতিহ্যে এবং সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাস করেন না; তাঁকে আপনারা বেহেশ্‌তে পাঠাইতে পারেন কি না, সেটা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

বলিয়া মিঃ গান্ধী এক পেয়ালা ছাগলের দুধ খাইয়া প্রার্থনায় বসিয়া গেলেন।

তারপর কথা বলিলেন জিন্না সাহেব।

মিঃ গান্ধীর দিকে বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটি করিয়া তিনি বলিলেন: সত্য বটে, আমি সত্য অহিংসা ভারতীয় জাতিত্ব ও ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি না; কিন্তু তাই বলিয়া আমি এ. আই. সি. সি-র নির্দেশ মানিতে বাধ্য, একথা বলা যাইতে পারে না। প্রথমতঃ শোক-প্রকাশ জিনিসটার মধ্যে খানিকটা গণতান্ত্রিক আঁচ আছে। এদেশে গণতন্ত্র চলিবে না; অতএব এভাবে শোক-প্রকাশও চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের কোনো 'লোকাস স্টাণ্ডি'ই নাই। হিন্দু ও মুসলমান দুইটা স্বতন্ত্র জাতি। হিন্দুরা মরিলে শ্মশানে যায়, মুসলমানরা মরিলে গোরস্তানে যায়। দুই জাতির পথই পৃথক। তাছাড়া হিন্দুরা যায় দুযখে, আর মুসলমানরা যায় বেহেশ্‌তে। অতএব এই দুই স্বতন্ত্র জাতির কনডোলেন্স একত্রে হইতে পারে না। মুসলমানদের জন্য পৃথক কনডোলেন্স লীগ গঠিত হওয়ার দরকার। আমরা শিয়ারা যে-ভাবে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলিয়া বুকে করাঘাত হানিয়া কনডোলেন্স করিয়া থাকি, শোক-প্রকাশের উহাই ইসলামী কায়দা। আপনারা যে-ভাবে অসাম্প্রদায়িক কনডোলেন্স কংগ্রেস গঠন করিয়া বিলাতি পার্লামেন্টারি ধরনে প্রস্তাবাকারে শোক-প্রকাশ করিতেছেন, মুসলিম জাতির দিক হইতে তাহাতে দুইটি মৌলিক আপত্তি আছে। প্রথমতঃ ইহা ভুঁয়া জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত; দ্বিতীয়তঃ উহা ইসলামের ঐতিহ্যবিরোধী। আমি শীঘ্রই এ. আই. এম. সি. এল. অর্থাৎ অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম কনডোলেন্স লীগ গঠনের আয়োজন করিতেছি। অতএব আমাকে মরিবার অনুরোধ করিবার কোনো আইনসংগত অধিকার আপনাদের এ. আই. সি. সি-র নাই। হাঁ, তবে মিঃ হক অসাম্প্রদায়িক প্রজা-সমিতি গঠন করিয়া মাঝে মাঝে মুসলিম-সংহতির গণ্ডির বাইরে চলিয়া যান। তিনি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন কি না, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

বলিয়াই জিন্না সাহেব নাকে ব্রিমলেস মনক্‌ল চশমা আঁটিয়া 'ফাইলে' মনোনিবেশ করিলেন।

হক সাহেব বগল ও মাথা চুলকাইতেছিলেন। তিনি জিন্না সাহেবের দিকে বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন: আমি মুসলিম, সংহতিও চাই, সাম্প্রদায়িক প্রীতিও চাই। তাই বলিয়া আমি এ. আই. সি. সি-র কথা মানিতে বাধ্য নই। প্রথম কারণ এই যে, যুদ্ধ চলাকালে হিন্দু জাতিত্ব ও মুসলিম জাতিত্বের প্রশ্ন অবান্তর।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম লীগ যদি স্বতন্ত্র কনডোলেন্স লীগ গঠন করেও তবু সেটা আমার উপর প্রযোজ্য হইবে না। দ্বিতীয় কারণ আমিও পাক্কা মুসলমান বটে, কিন্তু আমি বাংলার চারি কোটি গরীব প্রজার প্রতিনিধি। তাদের ডাল ভাতের যোগাড়ের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করিয়া তারা প্রতিদিন লাখে-লাখে পরলোকে চলিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় দুইটি কারণে আমি মরিতে পারি না। প্রথমতঃ উহাদের দেওয়া দায়িত্বে অবহেলা করিয়া আমি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমার নিজের লোকজন কৃষক প্রজারাই যখন আমার পক্ষ হইতে প্রতিদিন লাখে–লাখে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তখন আমার নিজের প্রাণত্যাগ করিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? আপনারা কি যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা কিছুই জানেন না? যুদ্ধে সেনাপতি পশ্চাৎ হইতে প্রতিদিন হাজার-হাজার সৈন্যকে শত্রুর কামানের সামনে ঠেলিয়া দেন। কিন্তু তিনি নিজে পশ্চাতে রক্ষি পরিবেষ্টিত থাকেন। তিনি নিজে আগাইয়া আসেন না কেন? যেহেতু তিনি আগাইয়া আসিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যুদ্ধ থামিয়া যাইবে। তাতে প্রতিদিন হাজার-হাজার লোক মরিবার চান্স হইতে বঞ্চিত হইবে। আমি আজ ডাল-ভাতের জন্য কায়েমী-স্বার্থীদের সহিত লড়াই করিতেছি। পশ্চাৎ হইতে প্রতিদিন আমি লাখে-লাখে কৃষক প্রজাকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠাইয়া দিতেছি। তাতে সংগ্রাম স্থায়ী হইতেছে। আমি নিজে মরিয়া গেলে মৃত্যুর পাঞ্জা লড়িবার জন্য এদের পাঠাইবে কে? অতএব আপনারা অন্য লোক দেখুন। আমার টাইম নাই। অন্যত্র আমার এনগেজ্‌মেন্ট আছে।

ডেপুটেশনের ফলাফল অল-ইণ্ডিয়া কনডোলেন্স কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে পেশ করা হইলে কংগ্রেসের মেম্বরদের মধ্যে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

নেতৃবৃন্দের কার্যে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া এক হাজার শব্দের একটি প্রস্তাব কংগ্রেসে পেশ হইল।

তবে ওয়াহিদ সাহেবের ধীর-মস্তিষ্ক কৌশলে ঐ প্রস্তাব সংশোধিত আকারে গৃহীত হইল। তাতে 'ফার্দার ক্ল্যারিফিকেশন' ও 'ইনফরমেশনের জন্য নেতৃবৃন্দের সহিত পত্র ব্যবহার করিবার এবং পুনর্বিবেচনার জন্য নেতৃবৃন্দকে আর মাত্র অর্ধ-শতাব্দীর সময় দিয়া এক চরম-পত্র দাখিল করিবার ক্ষমতা সমিতির সেক্রেটারি ওয়াহিদ সাহেবকে দেওয়া হইল।

'নেতৃবৃন্দ মুর্দাবাদ', এ. আই. সি. সি. জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে কংগ্রেসের বৈঠক অর্ধ শতাব্দীর জন্য এড়জোরও হইল।

১০, পৌষ-১৩৪৭

(১)

আকবর ও শমশের দুই বাল্যবন্ধু। অনেক দিন বাদে তাদের দেখা। কলকাতা শহরের পার্কে।

দুইজনেই একসংগে বলে উঠল: তুই এখানে? কি আশ্চর্য, জাপানী বোমার ভয় নেই?

আকবর একটু বেশি মুখর। নিজের কথাটা গলার জোরে চাপা দিবার মতলবে একটু চড়া গলায় বলল: তুই ত শুনেছি রংপুরে বা বরিশালে প্রফেসারি করছিস। কলেজ ছেড়ে এখানে কেন?

জবাব না দিয়ে শমশেরও প্রশ্ন করল: আর তুই? তুই ত ঢাকাতে ওকালতি করছিলি! তুইবা এখানে কি করতে এসেছিস?

দুইজনেই হেসে জবাব এড়াবার চেষ্টা করল। দু'জনাই বুঝল: ভেতরে গোলমাল আছে; কেউ পেটের কথা সহজে বলবে না

শুরু হলো জেরার ধস্তাধস্তি।

অবশেষে যে দুইটি বিস্ময়কর সত্য উদঘাটিত হলো তা এই: আকবর ওকালতি ছেড়ে আপাততঃ বছর পাঁচেক ধরে আইনসভার মেম্বরগিরি করছে এবং খোদার ফজলে খেয়ে-খরচে দেশে জমি-জমা ও জিলার সদরে খানকতক পাকা বাড়ি করেছে।

আর শমশের? সেও প্রফেসারি ছেড়ে আপাততঃ কন্ট্রাক্টরি করছে এবং বাড়িতে মোটর ও ব্যাংকে 'টু পাইস' মওজুদ করেছে

পরস্পরের সৌভাগ্যে খুশী হয়েই হোক অথবা কোনটা বেশি লাভজনক তা যাচাই করার মতলবেই হোক, দুই বন্ধুতে আরো কাছ-ঘেঁষে বসল এবং নিজের 'বিযিনেস সিক্রেট' যথাসাধ্য গোপন রেখে অপরের গোপন কথা বের করবার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

দু'জনেই বুঝল, ইতিমধ্যে দু'জনাই বেশ শেয়ানা হয়ে উঠেছে। কাজেই কথা নিতে হলে কথা কিছু দিতেও হবে, এটা বুঝতে তাদের বেশি সময় লাগল না।

বেশ খানিকটা শিথিল হবার জন্য তৈরি হয়েই শেষ চেষ্টাস্বরূপ আকবর বলল: তুই বেটা প্রফেসারি থেকে একেবারে কন্ট্রাক্টরিতে এলি কি করে? এ যে একেবারে ভিস্তিওয়ালার বাদশাহি পাওয়ার ব্যাপার!

শমশের একটু অপমান বোধ করল। তাই পাল্টা আঘাত করবার মতলবে বলল: তুই বেটা ওকালতি থেকে এম, এল, এ হয়েছিস এটাই বা আমি কিরূপে বিশ্বাস করবো? কোনো দিন তো খবরের কাগজে তোর নাম গন্ধও পেলাম না।

আকবর রাগ সামলিয়ে বলল: দেখছি আইন সভার মেম্বরের কর্তব্য সম্পর্কে তোমার ধারণা আজও নিতান্ত মামুলি ধরনের! বক্তৃতা মূলতবি প্রস্তাব আইন রচনা ইত্যকার হৈ চৈ নিয়ে যদি সময় নষ্ট করতাম, তবে আমার জমি-জমা বাড়ি-ঘর করাও হত না, নিজের ছেলে-জামাইর প্রভিশন করাও হত না। ও সবের মধ্যে আমি নেই! যা করবার আমি সাইলেন্টলিই করে যাই। পরের ভাল-মন্দের ভাবনা ভেবে আমি সময় নষ্ট করি না।

শমশের আকবরের কথার সারবত্তা বুঝতে পেরে বলল: আমিও তাই চাই! কিন্তু আমার জানা দরকার তুমি আছ কোন দলে?

হেসে আকবর বলল : এ বিষয়ে আমার ভুল–ভ্রান্তি হবার জো নেই। হক সাহেব যতদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ততদিন ছিলাম হক সাহেবের দলেই। এখন স্যার নাজিম প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আমি তাঁর দলেই আছি। স্যার নাজিমের ভাই-এর সঙ্গে আমার ভাব স্যার নাজিমের চেয়েও বেশি।

শমশের আকবরের হাত চেপে ধরে বলল: তুই সত্যই ওস্তাদ ছেলে। তোমাকেই আমার দরকার।

উদাসীন সুরে আকবর বলল : কি আমার করতে হবে বল?

'আমায় বাঁচাতে হবে তোমাকে।'

–বলে শমশের আকবরের হাঁটু চেপে ধরল,–পায়ে হাত দেয় আর কি।

আকবর সহজ সুরে বলল : পাগলামী রাখ। বল কি করতে হবে। কন্ট্রাক্ট চাই?

শমশের: চাই বই কি? কিন্তু আপাততঃ তার চেয়ে বড় জিনিস চাই– জান–ভিক্ষা চাই। হক-মন্ত্রিত্বের আমলে আধা বখড়ায় মাড়োয়াড়ির টাকায় চালের বড় কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলাম। হঠাৎ হক সাহেবের মন্ত্রিত্ব গেল। অমনি আমার কন্ট্রাক্টরিও গেল। শুধু কি তাই? গভর্ণমেন্ট কন্ট্রাক্টরির সুযোগে কিছুটা চাল গুদামজাত করেছিলাম। এখন তো ধনে-প্রাণে মারা যাবার মতো হয়েছি। মওজুদদারি ও মুনাফা খোরির অভিযোগে আমাকে চালান দেবার ভয় দেখানো হচ্ছে। কি করি এখন উপায়? খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সাহেব যে সব তেজালো ইশ্‌তাহার ছেড়েছেন, তাতে তো আর রক্ষে দেখছি না ভাই।

আকবর হো হো করে হেসে উঠল। বলল: এই কথা আমি ভাবছিলাম, না জানি কি বিপদেই পড়েছ।

আকবরের হাসি শুনে শমশের নিরাশ হল। বলল: তুমি আমার বিপদটাকে গ্রাহ্যই করলে না দেখছি। উল্টা ঠাট্টা করছ?

আকবর অতি কষ্টে হাসি চেপে বলল : ঠাট্টা আমি করছি না ভাই। তোমার কোন ভয় নেই যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা তুমি করতে পার।

শমশের ধরা গলায় বলল: উপযুক্ত ব্যবস্থা মানে টাকা তো? যত লাগে আমি খরচ করব। আমাকে বাঁচায়ে দাও। কোন উপায় কি সত্যি আছে ভাই?

শমশের আবার আকবরের হাত চেপে ধরল।

আকবর বলল: নিশ্চয় আছে।

আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে শমশের বলল: কি উপায়?

আকবর অবিচলিত গলায় বলল: লঙ্গরখানা।

শমশের : লঙ্গরখানা? সে আবার কি?

আকবর : বলছি, কিন্তু তার আগে একটা কথা ফয়সালা হওয়া দরকার!

শমশের : কি কথা?

আকবর : কিছু মনে করো না-বিয়্নেস ইয্ বিয্নেস। আমি শুধু তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচায়ে দিব না, বিরাট লাভের ব্যবস্থাও করে দিব। কিন্তু তাতে আমার অংশ থাকা চাই।

খুশীতে দাঁত বের করে শমশের বলল : আমাকে শুধু বাঁচিয়ে দিবে না, লাভের বন্দোবস্তও করে দিবে? তুমি যা চাও তাই পাবে আকবর ভাই। তুমি আমার বন্ধু নও, তুমি আমার বাবা!

কৃত্রিম ধমক দিয়ে আকবর বলল: ফাজলামি রাখ, কাজের কথা কও। লাভের অর্ধেক আমায় দিবে কিনা?

শমশের গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল : অর্ধেক তোমায় দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু উপরওয়ালাকে কে দিবে?

আকবর বলল: উপরওয়ালা আবার কে? আমিই ত ওটা সরায়ে দিব।

শমশের: দেওয়ানী সরবরাহ বিভাগের বড় কর্তারা-এই ধর ওজির-নাজির সাহেবান। তাদের কেউ কিছু চাইবেন না?

আকবর নাক বাঁকা করে বলল : হে আমার কাজে আবার মন্ত্রীরা টাকা চাইবেন? দলে থেকে নিজের ভোটটা দিচ্ছি, আবার পরের ভোট ক্যানভাসও করছি। সে কি অমনি? না, কাউকে কিছু দিতে হবে না। এই সুবিধার জন্যই ত মন্ত্রীদের দলে আছি। নইলে এদের সাথে থাকে কে? এইবার বল আমায় কি দিবে?

শমশের : আচ্ছা অর্ধেকেই রাজি।

আকবর : তবে চল আমার সংগে থিয়েটার রোডে।

শমশের : না ভাই থিয়েটার দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার এখন নাই, আমাকে বিপদ থেকে বাঁচায়ে দাও, 'বক্স' করে আমি তোমার পরিবার-শুদ্ধ থিয়েটার দেখাবো।

আকবর : দূর পাগল। আমি থিয়েটারের কথা বলছি না। থিয়েটার রোডের কথা বলছি!

শমশের : সেখানে কেন?

আকবর : আমাদের পার্টি মিটিং হবে মন্ত্রীর বাড়িতে।

শমশের আশ্বস্ত হয়ে বলল : চল।

থিয়েটার রোড। ওজিরের বালাখানা। গেটের সামনে লাল পাগড়ি পরা পুলিশ টুলের উপরে বাদশাহী মেজাজে বসে আছে। আর তক্‌মা-পরা চাপরাশিরা চাকুরির উমেদারদের সংগে কানাকানি করছে। এই উমেদারের ভিড় বোধ হয় অনেকক্ষণ থেকেই জমেছে। কারণ বেলা এগারটার সামান্য রৌদ্রেই এদের অনেকের নাকে-মুখে ঘাম দেখা যাচ্ছিল।

আকবর সংগে থাকায় শমশেরকে উমেদারি আর করতে হলো না। বরঞ্চ চাপরাশীরা আকবরকে সেলাম দিল। শমশেরকে নিয়ে আকবর সদর্পে গেট পেরিয়ে বালাখানায় ঢুকে পড়ল।

হলের মধ্যে ভয়ানক হট্টগোল হচ্ছিল। সবাই কথা করছিল; কেউ কারো কথা শুনছিল বলে মনে হল না।

আকবরের পিছে-পিছে শমশেরও হলঘরে প্রবেশ করল এবং আকবরের দেখাদেখি ফরাসের এককোণে বসে পড়ল।

মিটিং- এ ওজির সাহেব ছিলেন না। আকবর পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল: ওজির সাহেব সবে ঘুম থেকে উঠলেন এবং শিগগীর আসছেন।

শমশের আকবরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল: দেশবাসীর খাদ্য সমস্যার ভাবনায় ওজির সাহেবকে সারারাত জাগতে হয় বলে তিনি বারবার এমনি সময়ে ঘুম থেকে উঠে থাকেন।

ওজির সাহেবের প্রতি ভক্তিতে শমশেরের বুক ভরে উঠল।

এমন সময় চাপরাশী ওজির সাহেবের আগমন ঘোষণা করল। নাইট গাউনপরা ওজির সাহেব হলে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।

ওজির : সভার সময় হয়েছে?

জনৈক: ছটায় সভা হবে বলে নোটিশ দিয়েছি। এখন এগারোটা বাজে। কাজেই সভার সময় হয়েছে বলা যেতে পারে।

শমশের আকবরের নিকট জানতে পারল, উনিই চীপ হুইপ।

ওজির চারদিক চোখ ফিরায়ে চীপ হুইপ্‌কে বললেন: হাজির এত কম কেন?

জনৈক : সবাই ছটায় এসেছিলেন। এগারোটা বাজে দেখে তাঁরা বিল ভাংগাবার জন্য একাউন্ট অফিসে গিয়েছেন।

ওজির সাহেব মুখ ভার করে বললেন: হেঁ খালি বিল আর বিল। পাশ করা আর সাবমিট করা; সাবমিট করা আর পাশ করা। এই মতলবেই ইনলোগ্ মেম্বার বনছে দেখতা হ্যায়।

জনৈক: হবে না হুজুর? খরচা কত বেড়েছে। আমরা যে মাত্র শ'চারেক টাকা পাচ্ছি। তাতে কি আমাদের চলে?

ওজির : কাহে চলবে না? মেম্বর হবে কি আগে তোমরা কেৎনা রোজগার করতে? তখন তোমলোগকা কেমন চলতে আছিল। হাম যে লাখ লাখ রুপেয়ার ব্যারিস্টারি ছোড়কে সেবেফ চারি হাজার লেকে ওয়ারত করতে আছে, হামার চলছে কেমন করিয়া? হামারে দেখিয়া কি তোমলোগ না শিখতে পারতে আছে।

জনৈক: আপনার কিভাবে চলছে, সে সম্বন্ধে বাজারের চলতি কথা যদি এখানে বলি হুজুর, তবে আপনি রুখে আসবেন আমাদের মারতে। আর আপনাকে দেখে শিখবার কথা যে বলছেন, আপনার দেখা পাওয়াই যে ভার। সেই দু'টা থেকে জোহোজারি করে করে এই এগারোটায় ত সবে মুখ দেখলাম।

ওজির : বাজারের বাৎ ছোড় দাও। বদমায়েশ লোগের কথায় হর্ গেয কান দিবে না। দুশমন হামাদের ওয়ারত বরদাশ্ত করতে সেক্‌তে আছে না। তাই ঝুট-মুট বদনাম করতে আছে। আর সোবেমে ওটবার বাৎ যা বলতে আছে, হামাকে ত তামাম রাত জাগতে লাগতে আছে ঐ ফুড প্রব্লেম-তোমরা যাকে বল খাদিয়া সমুসা—ওটার ইয়ে করতে।

দ্বিতীয় : খাদিয়া-সমুসা কি বলছেন হুজুর? খাদ্য-সমস্যা বলতে পারেন না? বাংলা বলতে পারেন না আপনি?

ওজির: হাঁ হা, বাংলা যবান হাম শিখ্‌তে আছে। পানসো রুপেয়া তন্‌খা দিয়ে মেমসাব টিউটার বহাল করিয়াছি। থোড়া রোযমে তোমলোগ দেখিয়া লইবে হাম্ বাংলা যবান মে কেৎনা লিয়াকৎ হাসেল কোরবে।

অপর : তা বাংলা যবান আপনার লিয়াকতের কথা এখন থাক। খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য রাত জেগে আপনি কতদূর কি করেছেন তাই বলুন।

দ্বিতীয় : কারো কারো তথ্‌তপোশের নিচে আপনি যে হানা দিয়েছিলেন, তাতে কি কিছু পাওয়া গেল?

তৃতীয় : আমরা শুনছি, আপনি তখতপোশের নিচে নাকি খড়ম ও চটিজুতা পেয়েছেন, সেগুলো কি হল?

চতুর্থ : বাজারে গুজব যে, এর একটা ওজির সাহেবের ডান গালে আরেকটা বাম গালে হজম হয়ে গিয়েছে। এটা কি ঠিক?

ওজির সাহেব রাগে টং হয়ে উঠলেন। তাঁর সুন্দর গাল দুটো লজ্জায় এমন রাঙা হয়ে উঠল যে, সত্যসত্যই যেন সেখানে ও দুটো জিনিসের চাগ পড়েছে।

কিন্তু তিনি রাগ সামলিয়ে বললেন : বদ্‌মায়েশ লোগরা বাৎ সে কান লাগানা ঠিক না আছে। হাম তোমালোগকো ঠিক বাৎলাইতেছি; খাদিয়া সমুসাকে–কি বল তোমলগ সমাধান, হাঁ সমাধান–কিনারা করিয়া ফেলেছে। আর কোন আন্দেশা না আছে।

অপর: আন্দেশা ত নাই হুজুর, কিন্তু আর ত লোককে বোঝানো যাচ্ছে না। রাস্তায় ত আর বের হবার জো থাকছে না। এখন যে লোকেরা মারতে আসে।

ওজির : মারতে আসবে? হামার পুলিশ আছে না? যে লোগ গোলমাল কোরবে, উসকো গেরেফতার করো; আর খাদিয়া-সমুসা? সেটা হাম ফয়সলা করিয়া দিবে। এহাঁতককে হাম এক ফন্দি করিয়া ফেলেছে।

দ্বিতীয় : কি ফন্দিটা করেছেন হুজুর, আমরা কি তা শুনতে পাব না?

ওজির : আলবৎ পাববে। কেনে পারবে না? তোমলোগকো সুনানেক ওয়াস্তেই ত আজ এই জলসা হামি বুলাইয়াছে।

তৃতীয় : কি ফন্দি সেটা?

ওজির : লঙ্গরখানা। হাম লঙ্গরখানা খুলাইবে। তামাম মুলুকমে হাম লঙ্গরখানা ওপেন করাবে। দেশকে হামি লঙ্গরখানা দিয়ে ছাইয়া ফেলবে। সারা বাঙলাকো হাম লঙ্গরখানা বানাকে ছাড়বে। দেখবে হাম কোন বেটা চাউঅল না খেয়ে থাকে।

চতুর্থ : লঙ্গরখানা? লঙ্গরখানা কি হুজুর?

ওজির : বাঙাল লোক ক্যা কইতে আছে! লঙ্গরখানা জানে না? লঙ্গরখানা কি আছে? আরে লঙ্গরখানা লঙ্গরখানা আছে। লঙ্গরখানা সমঝতে পারো না–এই চিসকো কহে ফ্রি কিচেন। মওজুদদার বদমায়েশ লোগ কুচুতেই চাউঅল ছাড়তে আছে না। হামারা পুলিশ বহুৎ তালাশ করিয়াও ধরতে সেকতেছে না। পুলিশ লোগ রিপোর্ট দিতে আছে কে বেওপারী লোক ডরকে খাতের চাউঅল গুম করিয়া ফেলিয়াছে। আগার সরকারকে তরফ সে বেওপারী লোগকে দিলাসা দেওয়া হয় কে তাদের সাজা দেওয়া না হোবে, তবে নাকি তারা চাউঅল নেকালতে রাজি হৈতে পারে! সে হামি ফন্দি করিছে কে যেৎনা বেওপারী গুদামমে চাউঅল আছে, উনলোগ আগার লঙ্গরখানা ওপেন করকে আদমি লোগের খানা গেলাইবে, তবে সরকার তাদের কিছু বলবে না। আর সমঝা?

তৃতীয় : সমঝলামত হুজুর, কিন্তু পয়সা দিয়ে লোক যেখানে চাল পাচ্ছে না, সেখানে ফ্রি কিচেনের চাল পাওয়া যাবে কোথায়?

ওজির সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন: এটা তোমলোগ সমঝবে না। বাঙ্গালকা দেমাগমে হৈটা ঘুছবে না। এসব বাৎ তোমলোগ মেরা উপর ছাড়িয়া দাও।

দ্বিতীয় (বরিশালের মেম্বর বলে মনে হল): আরে ছাড়িয়া ত হুজুর সবই দিচ্ছি। আমাদের আর আছে কি? শুধু মেম্বরগিরি সেটাও যে আর থাকে না। চালের একটা বিহিত করুন হুজুর।

ওজির : হাম তবে কি কহতে আছে? চাউঅলকা বন্দোবস্ত ত লঙ্গরখানামে হামি করিয়াছে।

তৃতীয় : আপনি ত সাহেব বলছেন বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু কি বন্দোবস্ত করেছেন তা না বললে আমরা কি বুঝব? লোককেই বা কি বুঝাব?

ওজির : তোমলোগ বাঙ্গাল আছে, তোমলোগ বুঝবে না। মগর হাঁ, আদমি লোগকো ত সমঝাতে হবে। তোমলোগ সমঝো আর না সমঝো, আদমি লোগকো সমঝাইয়া দাও।

দ্বিতীয় : কি সমঝিয়ে দেব সাহেব?

ওজির : সমঝিয়ে দাও ইয়ে বাত; যেতনা লোগ মুনাফাখোর মওজুদ করনেওয়ালা আছে, ওদেরকে হামি একটা চান্স দিতে রাজি আছে। উনলোগ যদি লঙ্গরখানা খুলবে তবে উনলোগের চাউঅলকা স্টক দেখা হবে না; উনলোগকো গ্রেফতার করা হবে না; বল্‌কে, থোড়া থোড়া চাউঅল তাদের রেওয়াতি হবে। উনলোগ দেশের তামাম গরিব-দুঃখীকে মওজুদ চাউঅল থেকে খানা খেলাইবে। রোজ কত লোগকে খানা খেলাইল, তার হিসাব রাখবে। আউর আখবারমে রোজ হিসাব শায়ে করবে। হামার অফিসর লোগ খাতাপত্র চেক করবে। কেমন এ স্কিম আচ্ছা হুয়া কি নেহি হুয়া?

অনেক এম. এল. এ একযোগে বলে উঠলেন: আলবৎ আচ্ছা হয়েছে হুজুর। এতে আমাদের অনেকেরই সুবিধা হবে।

ওজির সাহেব হেসে বললেন: তোমলোগকা সুবিস্তাকে খাতিরই ত হামলোগ ওযারত করতে আছে। নইলে হামাদের এতে কি মুনাফা আছে? হাম দেশকা মওজুদ চাউঅল বাহার করবার মতলবে অনেক পুলিশ লাগিয়াছে। মগর সাকসেসফুল হতে পারছি না। সো হাম এই ফন্দি নেকাল করেছি। হাম আগার ইচ্ছা করতে তব যুলুম করেও চাউঅল নেকালতে পারত। লেকেন হামি শুরুতেই যুলুম করতে চাই না। কংগ্রেসী আখবার-লোগ হামগোলকে ঝুট-মুট এলযাম লাগাবে। সো হামি আসানিসে কাম লইতে চায়।

আকবর মন্ত্রী সাহেবের এই স্কীমের কথা আগেই জানত। সুতরাং কে মন্ত্রী সাহেবকে দেখিয়ে-শুনিয়ে-পিছন থেকে বাহ্ বাহ্ করতে থাকল। দেখাদেখি অনেকেই মারহাবা মারহাবা করল।

শমশের লক্ষ্য করল যে, এই বিতর্কে তার বন্ধু আকবর বাহ-বাহ করা ছাড়া আর একটা কথাও বলল না। কিছু বলতে কেউ তাকে অনুরোধও করল না। আকবরকে

নিতান্ত অখ্যাত মেম্বর মনে করে শমশেরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। না, একে দিয়ে তার কাজ হবে না
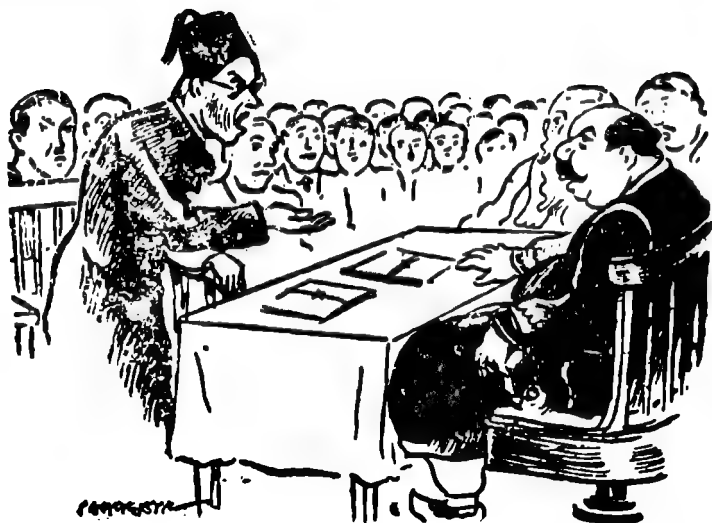
তোম্‌লোগ্‌কে খানার বন্দোবস্ত হামিই করতাম

এমন সময় শমশের বিস্ময়ের সংগে দেখল, আকবর নিজের আসন থেকে উঠে গিয়ে সোজা ওজির সাহেবের পিছনে গা ঘেঁষে বসল এবং তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলল।

ওজির সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন: হাঁ, এক বাজ গিয়া লাঞ্চকা টাইম হো গিয়া। সভার কাজ খতম হইল। তোম্‌লোগ্‌ আজ যার যার মকানমে চলিয়া যাও। আগে কা দিন হইলে তোম্‌লোগ্‌কে খানার বন্দোবস্ত হামিই করতাম! লেকেন আজকাল বহুত মুশকিল আছে।

সদস্যেরা ওজির সাহেবের কথা মতো তৎক্ষণাৎ উঠে গেলেন না। অগত্যা ওজির সাহেবই উঠে অন্য কামরায় চলে গেলেন। আকবর তাঁর সাথে-সাথে গেল এবং খানিক পরে শমশেরকে সেখানে ডাকল।

শমশের খুব নুয়ে ওজির সাহেবকে সেলাম করতেই তিনি বললেন: তুম্‌ কৌন্‌?

আকবর বলল: স্যার, এই আমার বন্ধু শমশের আলি। এর কথাই আমি আপনাকে বলছিলাম।

ওজির : হাম্‌ ক্যা করতে পারি?

আকবর : স্যার সবই করতে পারেন। মারতেও পারেন—বাঁচাতেও পারেন।

ওজির : মারনে বাঁচানেকা মালিক আল্লাহ। হাম ক্যা করতে পারি তাই বল।

আকবর : স্যার এ লঙ্গরখানা খুলতে চায়। আপনাকে দিয়ে ওপেন করাবে।

ওজির নরম বিছানায় গেড়ে শুয়েছিলেন। এক লাফে উঠে বস্‌লেন। বললেন : লঙ্গরখানা খুলবে? হাঁ হামি ওপেন করনে রাজি। মগর চাউঅল পাবে কাঁহা।

আকবর : সার ওর স্টকে চা'ল আছে। কিন্তু আপনার এনফোর্সমেন্টের লোকেরা ওকে গ্রেফতার করে চা'ল আটক করতে চাইছে।

ওজির : তোমার গুদামমে চাউঅল বহুত আছে?

শমশের : আছে হুযুর থোড়াবহুত।

ওজির : তুমি মুনাফাখোর মওজুদ করনেওয়ালা আছে! তোমার জেহেল হতে পারে, তা তুমি জান?

আকবরের ইঙ্গিতে শমশের বলল: হাঁ হুজুর।

ওজির : বহুত আচ্ছা। লঙ্গরখানামে কেতনা লোগ খেলাইবে?

শমশের : হুজুর যতো লোকের আদেশ করবেন।

ওজির : বহুত খুব। তোমকো এক লঙ্গরখানা মিলবে। আখবারমে ইশ্‌তাহার দাও। হাম ওপেন কোরবে।

(৩)

ওজির সাহেবের বালাখানা থেকে রাস্তায় বেরিয়েই শমশের বলল: বলে ত এলাম, যত লোকের হুকুম হবে তত লোক খাওয়াব; কিন্তু অত চা'ল পাব কোথায়? চা'ল কিনবার টাকাই বা পাব কোথায়?

হেসে আকবর বলল: পাগল আর কি! সত্য-সত্যই কি আর হাজার হাজার লোককে খাওয়াব নাকি? শুধু কাগজে-পত্রে হিসাব রাখব।

গম্ভীর গলায় শমশের বলল: সেটা কি আমি আর বুঝিনি? কিন্তু আমার গুদামে আছে মাত্র হাজার মণ। রোজ রোজ যদি দশ হাজার লোককে খাওয়াই তবে চার পাঁচ দিনের বেশি ত লঙ্গরখানা চলতে পারে না। তারপর লঙ্গরখানা চালাব কি দিয়ে, আর গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে টাকাই বা আদায় করব কি বলে?

আকবর বুঝল শমশের তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। সে বলল: ঠিক বলেছ শমশের। তবে উপায় কি করা যায়?

শমশের : উপায় একটা আছে; ভেড়ারাম ভাণ্ডারওয়ালা চালের বড় মজুদদার। তার সাথে পার্টনারশিপে বিযিনেস করলে লঙ্গরখানা বেশ কিছুদিন চালান যেতে পারে।

তাই ঠিক হল। পরদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল: বিখ্যাত ব্যবসায়ী শমশেরজী ভাণ্ডারওয়ালা এণ্ড কোং একটি লঙ্গরখানা খুলেছেন। তাতে রোজ দশ হাজার লোককে বিনামূল্যে দু'বেলা খাওয়ানো হচ্ছে। ফলনা দিন সরবরাহ ওজির সাব জাবেদাভাবে ঐ লঙ্গরখানা ওপেন করবেন। জজ ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ বাইরের বড়লোকেরা সব তশরিফ আনবেন। বিপুল ধূমধান হবে!

হলোও নির্দিষ্ট দিনে বিপুল ধূমধাম। নগরের শ্রেষ্ঠ ডেকরেটরে খাটালেন সুদৃশ্য শামিয়ানা। তৈরি হল সুন্দর গেট। সাজানো হল বিরাট মঞ্চ। তশরিফ আনলেন ওজির সাহেব ও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা। শ্রেষ্ঠ গায়কের ওপেনিং সং হল। সরকারের দেশপ্রিয়তা

শমশেরজী কোম্পানীর দানশীলতা ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা হল শেষে কনক্লুডিং সং হল।

কিন্তু কড়া পুলিশ পাহারা থাকায় সভায় কোনো ভুখা ভিখারী যেতে পারল না।

ভুখাদের জন্য সভামঞ্চের অদূরে টিনের সুদৃঢ় দেওয়ালের মধ্যে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে পুলিশ প্রহরার জোর ছিল আরো বেশি অনেক জেরার জবাব দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেখানে পাঁচ শতের মতো লোক। সঙ্কীর্ণ জায়গা, তাতেই হয়েছিল ভয়ানক ভিড়।

ওজির ও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজ হাতে চামচ ধরে ভাত খাওয়ালেন, তাদের সর্বত্র ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। তারপর শমশের ও তার মাড়ওয়ারী অংশীদারের দোকানের দরজা আর সামনের দিকে ওপেন হল না। তার বদলে পিছনের দরজা ওপেন হয়ে গেল. সেখান দিয়ে রোজ হাজার হাজার মণ চাউল চল্লিশ টাকা দরে বিক্রি হতে লাগল. শমশেরের কর্মচারিরা দৈনিক দশ হাজার লোকের হিসাব জমা-খরচ পাকা খাতায় সুন্দর হরফে লিখে যেতে লাগল।

শমশের লঙ্গরখানার মহাত্ম্য বুঝে ফেলল। নিজের লঙ্গরখানা ছাড়াও সে আরও দশ-বিশটা লঙ্গরখানা খুলবার দালালি শুরু করে দিলে এবং আকবরের সাহায্যে সে-সব কাজে সফলও হল

তার বদলে পেছনের দরজা ওপেন হয়ে গেল

দেখতে-দেখতে চারিদিকে লাখো-হাজারো লঙ্গরখানা ওপেন হয়ে গেল। সেবা সমিতি, রিলিফ কমিটি, দরিদ্র ভাণ্ডার, আঞ্জুমান খাদেমুল ইনসান প্রভৃতি অসংখ্য আর্তত্রাণ সমিতি হাজার-হাজার লঙ্গরখানা খুলল। প্রত্যেক লঙ্গরখানায় প্রত্যহ গড়ে দশ হাজার লোক বিনামূল্যে খাদ্য পেতে লাগল।

দেখতে-দেখতে এক কলকাতা শহরেই দশ হাজারেরও বেশি লঙ্গরখানা ফ্রি-কিচেন ক্যানটিন দানছত্র দরিদ্র-ভাণ্ডার সেবাশ্রম খোলা হয়ে গেল। এই দশ হাজারের বেশি লঙ্গরখানার প্রত্যেকটিতে দশ হাজারের বেশি দরিদ্রকে খাওয়ানো চলতে লাগল। কিন্তু বেশি দিন এভাবে গেল না। লঙ্গরখানার পরিচালকদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হল। একে অন্যের "ভেতরের কথা" প্রকাশ করে দিয়ে ওজির সাহেবের কাছে বেনামে ও ছদ্মনামে রিপোর্ট দিতে লাগল।

ওজির সাহেব সমস্ত লঙ্গরখানার মালিকদের তলব করলেন। রাইটার্স বিলডিং-এ সভা বসল।

ওজির সাহেব বললেন: তোমরা যতো লোককে খানা খেলাও তার হিসাব ঠিক আছে?

সকলে : হাঁ হুজুর।

ওজির : হামি হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, কলকাতানে যেতনা লোক আছে, তোমরা তার ডবল লোককে খেলাইতে আছে। এটা কেমন করিয়া হৈতে পারে?

শমশের : হুযুর লড়াই উপলক্ষে কলকাতার লোকসংখ্যা ডবলের বেশি হয়ে গিয়েছে।

ওজির : আগার তোমার বাত সাচ্‌ভী আছে, তবভী কলকাতার সব লোক লঙ্গরখানামে খানা খাইতে যায় না।

শমশের : সরকারী টাকার লঙ্গরখানা খুলেছি, কাউকে ত আর 'না' বলে ফিরিয়ে দিতে পারি না।

ওযির: হৈতে পারে ছোট লোকেরা সবাই লঙ্গরখানায় যায়; ভদ্দর লোকেরা ত কেউ যায় না।

শমশের : ভদ্রলোক কাকে বলেছেন হুজুর জানি না। তবে আপনার আইন সভার এম. এল. এরা প্রায় সবাই লঙ্গরখানায় খেতে যান। তাঁরা বলেন: সরকারী টাকায় খানার বন্দোবস্ত হয়েছে, তোমরা না দেবার কে? তাঁরা যে মাইনা ও ভাতা পান, তাতে নাকি তাঁদের দিন চলে না।

ওজির সাহেব ভয়ানক রেগে গেলেন। বললেন: এম. এল. এ-দর নিয়ে আর হামি পারছি না। হামি সব ব্যাটাকা নাম কাটিয়ে দিবে। লেকেন তোম্‌লোগকো হামি ক্যা সাজা দিবে? হামি সব ব্যাটাকো জেহেল মে ভেজিবে।

আকবর ওজির সাহেবের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে মিনতি করে বললো: হুজুর এরা কসুর করেছে; এদের শাস্তি আপনি দিতে নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু তাদের জেলে

দিলে কলকাতার লোকদের খাওয়াবে কে? হিসাব এরা না হয় একটু বেশ-কম করেই দিয়েছে, কিন্তু কম হোক বেশি হোক কিছু লোককে এরা খাওয়াচ্ছেত।

ওজির সাহেব : কুচ পরোয়া নেহি। এরা না খাওয়ায়, কলকাতার লোক হোটেলে খাবে নিজেদের বাড়িতে খাবে।

আকবর : তার উপায় নেই হুজুর। কলকাতায় আর কোন হোটেল নেই, সব লঙ্গরখানা হয়ে গিয়েছে। কারো বাড়িতে আর চুলা জ্বলে না। সবাই লঙ্গরখানায় খায়।

ওজির : ঝুট বাত।

আকবর : ঝুট কথা নয় হুজুর। আপনিই ত হুকুম দিয়েছিলেন যে, সারাদেশ আপনি লঙ্গরখানা করে ফেলবেন। আপনার কর্মচারীদের চেষ্টায় সারাদেশ লঙ্গরখানা হয়ে গিয়েছে।

ওজির : তবে আব্ ক্যা হোবে?

আকবর : এদের জেলে দেবার মতলব ত্যাগ করুন।

ওজির : রেহাই হামি এদের দিতে পারি এক শর্তে। এরা সরকারী তহবিল থেকে টাকা না নিয়ে লঙ্গরখানা চালাবে। দেশের লোককে বিনা পয়সায় খাওয়াবে।

আকবরের মধ্যস্থতায় সকলে রাজি হল। সবাই রেহাই পেল।

ওজির সাহেবের হুকুমে সরকারী কর্মচারীরা কড়া নজর রাখলেন। সুতরাং লঙ্গরখানা চলল।

কিন্তু আরেক ব্যাপার ঘটলো।

রিলিফ কমিটি ও সেবা-সমিতির চাঁদার বাক্স ও ভিক্ষার থলি বেরুলো। হারমনিয়ম বাজিয়ে গান গেয়ে চাঁদা তোলা চলতে লাগল। ব্যাজ-লাগানো সুন্দর শাড়ি-পরা মেয়েরা চাঁদার খাতা নিয়ে ট্রামেগাড়িতে চাঁদা আদায় করতে লাগল। আর্তত্রাণের মহান উদ্দেশ্য বহু বাজে অভিনেতা বহু বস্তাপচা নাটকের অভিনয় শুরু করে দিল। অনেক ঠ্যাং বাঁকা নাচিয়ে বড় বড় রঙ্গমঞ্চে নাচতে লাগল। বহুকাল আগে খেলাছেড়ে দেওয়া অনেক বুড়োগর্দা খেলোয়াড় বল নিয়ে চ্যারিটি শো'তে গড়ের মাঠে নেমে পড়ল।

আর্তত্রাণের আহ্বানে সর্বত্র দর্শকের ভিড় হতে লাগল। লাখ লাখ টাকার টিকিট বিক্রি হতে লাগল। সে টাকা সবই লঙ্গরখানার তহবিলে যেতে লাগল।

কিন্তু আশ্চর্য, লঙ্গরখানা সেবা-সমিতি রিলিফ কমিটি যত বাড়তে লাগল, অভুক্তের সংখ্যাও ততই বাড়তে লাগল। বিনামূল্যে যত বেশি খাদ্য বিতরণ হতে লাগল, উপবাসে-অনাহারে তত বেশি লোক মরতে লাগল। সেবা যত বেশি হতে লাগল, শ্মশানে গোরস্তানে ভিড় তত বেশি হতে লাগল।

শমশের মোটরে চড়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াল এবং ঘরে বসে একটা হিসাব করল।

তারপর একদিন সে আকবরকে বলল: শুধু লঙ্গরখানা চালিয়ে মাথা-পিছু যা থাকে, তার চেয়ে ঢের বেশি থাকতো যদি আমরা সৎকার সমিতি ও দাফন কমিটি চালাতাম। আমি হিসাব করে দেখেছি লঙ্গরখানার জনপ্রতি চাল-ডাল, লবণ-মরিচে এক টাকার বেশি কিছুতেই ধরা যায় না অথচ সৎকারে এবং দাফনে জনপ্রতি অনায়াসে চারটা টাকা ফেলা যায়। কাপড় ও কাঠের দাম যা হয়েছে, তাতে আরো কিছু বাড়ালেও ধরা যেতে পারে

অনেক ট্যাং-ব্যাঁকা নাচিয়ে বড় বড় রঙ্গমঞ্চে নাচতে লাগল

আকবর হা করে শমশেরের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বসে পড়ে শমশেরের পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। বলল: আজ থেকে আমি তোমাকে ওস্তাদ মানলাম। তুমি দেখছি বৃথা কন্ট্রাক্টরি করনি। তা এখন কি করতে চাও?

শমশের : আর কি করব? জনকতক হিন্দু জুটিয়ে একটা হিন্দু সৎকার সমিতি খুলব: আর জনকতক পশ্চিমা মুসলমান জুটিয়ে একটা আঞ্জুমান-ই দাফনুল ইসলাম খুলব।

আকবর একটু চিন্তিত হয়ে বললো: তবে কি লঙ্গরখানা ছেড়ে দিবে?

হো হো করে হেসে শমশের বলল: পাগল হয়েছ তুমি? লঙ্গরখানা ছেড়ে দেব কেন? ওটা ছাড়লে মজুদ চালগুলো ত এখনই সরকার সীয করবে। তাছাড়া দাফন কমিটি থাকবে করলারি হিসাবে। মৃত্যুটা ত জীবনের করলারি মাত্র। আমরা যখন লঙ্গরখানা খুলে মানুষের জীবনের ভার নিয়েছি, তখন দাফন কমিটি করে তাদের মৃত্যুর ভারও নিতে হয়। সেবা আমরা দু'দিক থেকে চালাব। ইহ-পরকাল উভয় দিককার ভার নিতে আমরা ন্যায়ত বাধ্য।

বলে শমশের হো হো করে হাসতে লাগলো।

পরদিন খবরের কাগজে বড় বড় হরফে খবর বেরুলো: খ্যাতনামা জনহিতব্রতী ব্যবসায়ী মেসার্স শমশেরজী ভাণ্ডারওয়ালা এণ্ড কোং হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সমস্ত মৃতদেহের সৎকারের পবিত্র দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, সমস্ত শবদেহেরই সৎকার মৃতের ধর্ম ও শাস্ত্রানুযায়ী পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁতভাবে করা হবে; সেজন্য বহু আলেম পণ্ডিত পদ্রী ও ভিক্ষুর সেবা-কার্য রিকুইজিশন করা হয়েছে।

শমশেরজী ভাণ্ডারওয়ালা কোম্পানী সেবাকার্যে সমস্ত সওয়াব একা লুণ্ঠন করে স্বর্গ ও বেহেশ্‌তে মনপলি প্রতিষ্ঠা করেছে দেখে দেশের আরো বহু সেবা ধর্মী একাজে অগ্রসর হলেন! ফলে প্রত্যেক লঙ্গরখানার ব্রাঞ্চরূপে একটা করে সৎকার ও দাফন সমিতিও চালু হয়ে গেল। সমস্ত সমিতির এম্বুলেন্স গাড়ী দ্রুতবেগে শহরের রাস্তাঘাটে দৌড়াদৌড়ি করে মোটর চাপা দিয়ে নিজেদের ধর্মকার্যের স্কোপ সম্প্রসারণ করতে লাগল।

এইভাবে জ্যান্তের সেবা ও মৃতের সৎকার-কার্য দ্রুতবেগে চলতে লাগল। সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বন্ধ করে সেবা ও সৎকারে মনোনিবেশ করল। উকিল-মোক্তার ওকালতি মোক্তারি ছেড়ে, ব্যাঙ্কওয়ালা ব্যাঙ্কিং ছেড়ে, বীমা-এজেন্ট ক্যানভাসিং ছেড়ে, দোকানদার দোকানে তালা দিয়ে সেবা ও সৎকারে লেগে গেলেন। কলকাতায় সমস্ত দালান-কোঠা সেবা সমিতির অফিস হাসপাতালে পরিণত হল। ময়দান ও পার্ক গোরস্তান ও শ্মশানে পরিণত হল। ব্যবসায়ী বিলাসী প্রমোদমত্ত কলকাতার নাগরিক এক সেবাপরায়ণ স্যালভেশন আর্মিতে পরিণত হল।

আর্তসেবায় বাঙ্গালির প্রশংসা করে দেশ-বিদেশ থেকে মোবারকবাদের টেলিগ্রাম আসতে লাগল।

(৪)

ওজির সাহেবের বাড়িতে সভা। আইন সভার মেম্বর এবং লঙ্গরখানা ক্যানটিন রিলিফ কমিটি সেবাশ্রম সৎকার-সমিতি ও দাফন-কমিটির সদস্যদের সদলবলে সভায় ধরে আনা হয়েছে। শমশেরও আছে।

ওজির সাহেব সভার উদ্বোধন করে বললেন: হামি তোমলোগকো লঙ্গরখানা বানাইতে হুকুম দিয়াছিল, মানুষ মারতে ত হুকুম দিয়াছিলাম না। তোমলোগ দেশের সব মানুষ মারিয়া ফেলিয়াছে।

একজন : হুজুর আমাদের দোষ নেই। আমরা ত লোকজন বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

ওজির : কুছু চেষ্টা তোমলোগ করনি। চেষ্টা করলে সবলোগ মরত না। আব হাম লাটসাবকো ক্যা কৈফিয়ত দিবে?

আকবর: আপনার দোষ কি হুজুর, আপনি ত আর নিজ হাতে রান্না করে লোকজনকে খাওয়াতে পারতেন না। আপনার কাজ আপনি করেছিলেন; সরকারী টাকা খরচে লঙ্গরখানা খুলিয়েছিলেন। লোকগুলো বাঁচল না তাদের হায়াত ছিল না বলে। দুনিয়াটা মুসাফিরখানা বই ত নয়।

শমশের : তাছাড়া আমরা খুব ধূমধামের সংগে দাফন ও সৎকার করেছি। লাশের প্রতি কোন অসম্মান হতে দিই নি। নিশ্চয় ওরা সব স্বর্গে ও বেহেশ্‌তে গিয়েছে।

ওজির : বহুত আচ্ছা করেছ। তাদের ভালই করেছ। লেকেন দেশের লোক যে মরে গেল, আমাদের ভোট দিবে কে? কার ভোটে হামি আয়েন্দাতে ওজির হব?

এম. এল. এ. গণ : হুজুর আমরা ভোট দিব।

ওজির : গাধা, তোমলোগকো এম. এল. এ বানাবে কোন? না, হামার মিনিস্ট্রি ইয য়্যাট স্টেক্‌। হামি লঙ্গরখানা আর রাখবে না। সব ভাঙিয়ে দেব।

শমশের : লঙ্গরখানা যদি ভাঙতে চান হুজুর, তবে আইনসভাও ভাঙতে হবে। কারণ আইনসভাও একটা লঙ্গরখানার মতো।

ওজির : হাঁ আইনসভাও ভাঙ্গিয়ে দিবে।

এম. এল. এ গণ: যদি আইনসভাও ভাঙতে চান সার, তবে মিনিস্ট্রিও ভাঙতে হবে। কারণ মিনিস্ট্রই আজ সবচেয়ে বড় লঙ্গরখানা।

ওজির : তা হোবে না। মিনিস্ট্রি ছাড়া হামার চলবে না।

মওজুদদারগণ : লঙ্গরখানা ছাড়া আমাদেরও চলবে না।

লঙ্গরখানা, সবই লঙ্গরখানা, আইনসভাও লঙ্গরখানা, লঙ্গরখানাও লঙ্গরখানা, সবই লঙ্গরখানা, আর দুনিয়াটা মুসাফিরখানা। হর চিযকা আখেরফানা আখেরফানা। আপনা-আপনি সব ভাঙিয়া যাইব। তবে কিছুই ভাঙিয়া দেওয়া দরকার না আছে।

সকলে : লঙ্গরখানা মুসাফিরখানা আখেরফানা।

২রা আশ্বিন ১৩৫২

রিলিফ ওয়ার্ক

বন্যা।

সারা দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামকে গ্রাম ধু ধু করিতেছে। বিস্তীর্ণ জলরাশির কোথাও কোথাও ঘরের চাল ও বাঁশের ঝাড়ের ডগা গলা জাগাইয়া লোকালয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

এই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে মৃত্তিকার গৌরব ঘোষণা করিতেছে শুধু কোম্পানীর উঁচু রেল-সড়ক। এই রেল-সড়কই হইয়াছে বন্যা-বিতাড়িত পল্লীবাসীর একমাত্র আশ্রয়স্থল। যারা রেল-সড়কের মাটিতে জায়গা পায় নাই, তারা কলাগাছের ভেলা তৈরি করিয়া সপরিবারে সেই ভেলায় ভাসিতেছে।

দু'পাশের দু-দশখানা গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া এই সড়কের উপর আশ্রয় লইয়াছে। রেল সড়কে তিল ধারনের স্থান নাই। মানুষ, পশু, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সড়কের উপর ভিড় করিয়া নৈসর্গিক বিপদের সাম্য-সাধনা-ক্ষমতা ঘোষণা করিতেছে।

যাঁহারা এতদিন দেশে উঁচু রেল স্থাপনের বিরোধিতা করিয়াছেন, যাঁরা বলিয়াছিলেন উঁচু রেল লাইন প্রতিষ্ঠাই দেশে অকল্যাণের কারণ তাঁরা আজ নিজেদের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া দাঁতে আঙ্গুল কাটিতেছেন। বন্যা ত এদেশে হবেই। তার উপর যদি উঁচু রেল-সড়কটাও না থাকে, তবে পোড়া দেশের লোক দাঁড়াইবে কোথায়?

(২)

বন্যাপীড়িত দেশবাসীর দুঃখে দেশহিতৈষী পরহিত-ব্রতী নেতৃবৃন্দের হৃদয় হুঙ্কার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কর্মীগণের চোখের দু'পাতা আর কিছুতেই একত্র হইতে চাহিতেছে না। সংবাদপত্র-সম্পাদকের কলমের ডগা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

দিকে-দিকে রিলিফ কমিটি স্থাপিত হইতেছে। রিলিফ কমিটির রশিদ বই ছাপিতে গিয়া কম্পোজিটগণের ঘুম নষ্ট কাজে, আর প্রতিবেশীর ঘুম নষ্ট প্রেসের আওয়াজে।

রিলিফ কমিটির কর্মীগণ গলায় হারমনিয়ম ঝুলাইয়া দলে দলে মর্মান্তিক গান গাহিয়া চাঁদা তুলিতেছে। সে গানের মর্মান্তিকতায় গৃহলক্ষ্মীরা দোতলার বারান্দা হইতে হাতের বালা খুলিয়া কর্মীদের প্রসারিত ঝোলায় ছুরিয়া মারিতেছেন। কর্মীরা সমস্বরে দাত্রীদের জয়ধ্বনি করিতেছে।

হামিদ চিরকালটা কেবল সংবাদপত্রে বন্যা দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাঠ করিয়া কাটাইয়াছে। স্বচক্ষে সে কোনও দিন তা দেখে নাই। এবার স্বচক্ষে এই নৈসর্গিক বিপদের চেহারা দেখিয়া, আর খানিকটা বা কর্মীদের গানের মর্মান্তিকতায় আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় তাহার একবারে গলিয়া গেল।

সেদিন সে অফিসে বেতন পাইয়াছিল। পকেটে একমাসের বেতন ৪৩।।/৩ লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। মন তার কিছুতেই মানিল না। চাঁদা আদায়কারীদের দলপতির হাতে সে তিনখানা দশ টাকার নোট গুজিয়া দিল। দলপতি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নাম বলিল। তিনি ধন্যবাদের জয়ধ্বনি করিবার ইশারা করিলেন। হামিদের নাম সংযোজিত জয়ধ্বনি তিনবার উচ্চারিত হইল। হামিদ নিজের নাম শুনিয়া লজ্জায় দ্রুতগতিতে বাসায় চলিয়া আসিল। পশ্চাতে নিজের নামে বিপুল জয়ধ্বনি হামিদের কানে বড়ই খারাপ লাগিতে লাগিল।

(৩)

পরদিন সকাল না হইতেই বাড়ির বাহিরে মোটরের আওয়াজ শুনিয়া হামিদ বাহিরে আসিল। দেখিল স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বারের শ্রেষ্ঠ উকিল কয়েকজন সাপাঙ্গসহ হামিদের কুটিরদারে দাঁড়াইয়া। হামিদ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বসিবার ভাঙা চেয়ার টানাটানি আরম্ভ করিল। নেতাজি বাধা দিয়া বললেন: "ভদ্রতার কোনও প্রয়োজন নাই। দুস্থ উৎপীড়িত মেহমানদের পক্ষ হইতে আপনি রিলিফ কমিটির ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এত বড় একটা অন্তঃকরণ লইয়া আপনি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন না। আপনি রিলিফ কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কমিটির মিটিং এ আপনি উপস্থিত থাকিলে আমরা গৌরব বোধ করিব।"

ভদ্রলোক একদমে এতগুলি কথা বলিয়া হামিদের হাত ধরিয়া একটা বিরাট ঝাঁকের ঝাঁকি দিয়া মোটরে উঠিয়া পড়িলেন। মোটরে বসিয়া আবার দুই হাত তুলিয়া হামিদকে নমস্কার করিলেন। মোটর ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। হামিদ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

বিকালে অফিসে বসিয়া হামিদ রিলিফ কমিটির সভার নিমন্ত্রণ পাইল। জনসেবা মহৎ কার্যে সে জীবনে কোনও দিন যায় নাই। দেশ ও জনসেবকদিগকে চিরকাল দূর

হইতে সে সারাঅন্তঃকরণ দিয়া ভক্তি করিয়া আসিয়াছে। আজ জীবনে প্রথম নিজেকে জনসেবকদের পবিত্র দলের একজন হইতে দেখিয়া সে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল।

বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোক এড়াইয়া অতি সাবধানে-সন্তর্পণে এক রকম গা ঢাকা দিয়া হামিদ সভায় গেল। জিলার খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ ও দেশকর্মীগণের মধ্যে পড়িয়া সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। সভায় যাহাদিগকে সে উপস্থিত দেখিল, প্রত্যহ ইহাদের নাম পাঠ করিয়া শ্রদ্ধায় কতবার ইহাদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে এক সভায় বসিয়া দেশ সেবার আলোচনায় যোগদান করিবে হামিদ? নিজেকে সে কিছুতেই অতখানি বড় করিয়া ভাবিতে পারিল না।

হামিদকে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সভাপতি মহাশয় নানা প্রকার অতিশয়োক্তি সহকারে সমবেত নেতৃবৃন্দের কাছে হামিদের পরিচয় দিলেন। হামিদ মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সভায় অনেক আলোচনা হইল। বাক বিতণ্ডা হইল। মর্মস্পর্শী ভাষায় বন্যা-পীড়িতদের দুরবস্থা বর্ণিত হইল। সে সব বক্তৃতায় ক্ষণে-ক্ষণে হামিদের রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াই আলোচনায় যোগদানের সাহস তাহার হইল না। সব কথা সে শুনিলও না, বুঝিলও না।

সভা-শেষে সকলে তাহাকে কংগ্রাচুলেট করিতে লাগিলেন। অতিকষ্টে সে কংগ্রাচুলেশনের কারণ জানিল যে কয়েকটি কেন্দ্রের পরিদর্শনে ভার তাহার উপর দেওয়া হইয়াছে।

(৫)

আর্তমানবতার সেবা-কার্যের জন্য ছুটি চাওয়া মাত্র অফিসের বড় কর্তা হামিদের ছুটি মনজুর করিলেন। জীবনে এই প্রথম আর্তমানবতার সেবাকার্যের জন্য পল্লী অঞ্চলের বন্যাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশবাসীর মধ্যে হামিদ ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর্ত জনসেবায় অনভ্যস্ত সে। প্রথম কয়েকদিন সেবাকার্যের পদ্ধতির সঙ্গে সে নিজেকে কিছুতেই মানাইয়া চলিতে পারিল না। সেবাকার্যকে সে যতটা কষ্টকর, সুতরাং স্বর্গীয় মনে করিত, ততটা কোথায়ও দেখিল না বলিয়া প্রথম-প্রথম তার মনটা একটুখানি কেমন-কেমন করিতে লাগিল। মোটরলঞ্চে করিয়া জলে ভাসমান ভেলায় বাস-করা অভুক্ত কঙ্কালসার কৃষকগণকে দু-চার সের চাউল দিয়া আসিয়া রাত্রিবেলা তাম্বুর মধ্যে রাশি রাশি কম্বল-বিছানা খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতে অথবা চা-সিগারেট সহ রাত্রি জাগিয়া তাস পিটিতে হামিদের প্রথম-প্রথম ভাল লাগিল না। কিন্তু সহকর্মীদের যুক্তিবলে কতকটা এবং নিজের অভিজ্ঞতায়ও কতকটা কয়েকদিনেই হামিদ বুঝিয়া উঠিল যে, সেবাকার্যের মতো অমন কঠোর কর্তব্য সাধন করিতে গেলে কর্মীদের দেহ জুৎসই টেকসই রাখিবার জন্য ওসবের দরকার আছে। সে

নিজে মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; পারিলও কতকটা। সে দেখিল রিলিফ ফান্ডের টাকায় চৌদ্দআনা কর্মীদের ভরণ-পোষণে ব্যয় হইতেছে। বাকী দুই আনায় মাত্র সেবাকার্য চলিতেছে। তবু সেবা-কার্যে আনাড়ি সে ইহার প্রতিবাদে সাহসী হইল না। কারণ হয়ত বা এমন না হইলে সেবা কার্যই চলে না।

(৬)

হামিদ একদিন একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছে। দেখিল রিলিফ কমিটির তাম্বুর সামনে কাতার করিয়া শ'দুই অর্ধনগ্ন পুরুষ-স্ত্রী, ছেলে-বুড়ো, বালক-বালিকা টিকিট হাতে করিয়া বসিয়া আছে। অর্ধনগ্ন যুবতীরা ছেঁড়া নেকড়ায় মুখ ও বুক ঢাকিয়া জড়সড় হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া আছে, তবু একহাত ঈষৎ উঁচু করিয়া টিকিট ধরিয়া আছে। কারণ রিলিফ অফিসারের নিয়ম কড়া। সাহায্য প্রার্থীর সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে এবং টিকিট দেখাইয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। মেয়েদের কোলে অশান্ত শিশুগুলি ক্ষুধার তাড়নায় হাত-পা ছুড়াছুড়ি করিয়া মাদের ছেঁড়া নেকড়ায় বুক ঢাকিবার চেষ্টা বার বার ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

হামিদের গা কাঁটা দিয়া উঠিল। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে সে বলিল: ইহাদের বসাইয়া রাখিয়াছেন কেন? বিদায় করিয়া দিন না।

হামিদের স্বরে একটু বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

কেন্দ্রকর্তা হামিদের বিরক্তিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন: ইহাদের গণনা শেষ হয় নাই। কই হে নগেন, ইহাদের রেজিস্টারিটা বাহির কর ত।

নগেন্দ্র নামক কর্মীটি একটি রুল-করা বাঁধাই বড় খাতা বাছিয়া বাহির করিয়া কাতারের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে নাম ডাকিতে লাগিল: আর কাতারের মধ্যে হাজির হাজির জবাব আসিতে লাগিল। কিছু কিছু মুশকিল হইতে লাগিল যুবতী স্ত্রীলোকদের লইয়া। তাহারা একেবারে কিছুতেই উচ্চস্বরে 'হাজির' ঘোষণা করিতেছিল না। কয়েক বারের চেষ্টায় এবং উচ্চস্বরে চিৎকার না করিলে কিছুতেই সাহায্য দেওয়া হইবে না এই প্রকারের শসানিতে 'হাজির' ঘোষণা করিতে রাজি হইতেছিল।

নাম ডাক শেষ হইলে উহাদের টিকিট চেক শুরু হইল। একজন কর্মী কাতারের এক মাথা হইতে লাল-নীল পেন্সিল দিয়া টিকিটে দাগ দিয়া যাইতে লাগিল। আরেকজন তার পিছে পিছে পেট বুঝিয়া এক ছটাক করিয়া চাউল বিতরণ করিয়া যাইতে লাগিল। অধিকাংশ সাহায্যার্থী আগ্রহভরে কাপড়ের আঁচল পাতিয়া নীরবে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। মাত্র দুই একটা বেয়াড়া লোক 'এতে কি হবে বাবু' বলিয়া গোলমাল করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কর্মীদের ধমক ও চোখ রাঙানিতে তাহারা চুপ করিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতে থাকিল।

(৭)

প্রায় অর্ধেক লোককে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, এমন সময় তাম্বুর সামনে একখানা নৌকা ভিড়িল।

দুইজন ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিলেন। কেন্দ্রকর্তা 'আসুন চক্রবর্তী' মশাই, আসুন চৌধুরী সাহেব" বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া হামিদের নিকট আনিলেন এবং লোহার চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

তারপর তিনি হামিদের দিকে চাহিয়া বলিলেন: ইন্‌স্পেক্টর সাব, এরা দুইজন রঘুনাথপুরের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শমশের আলী চৌধুরী। আহা! বন্যায় ভদ্রলোকদের যা অবস্থা হইয়াছে, তা আর বলিবার নয়। গোলার ধান চাল সব বন্যায় ভাসাইয়া নিয়াছে। কই হে শরৎ, বাবুদের চাল-ডালটা নৌকায় পৌঁছাইয়া দাও ত।

যতীন বাবু ও চৌধুরী সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন: না, না, এরা দিয়া আসিবে কেন, আমাদের সঙ্গেই লোক আছে। কইরে রামটহল, ইনাতুল্লাহকে সঙ্গে নিয়া এখানে আয় ত।

চৌকিদারী ইউনিফর্ম পরা লোক নৌকা হইতে ছালা ও ডালি লইয়া নামিয়া আসিল।

এতক্ষণ সমবেত কৃষকগণের মধ্যে যাহারা চাউল বিতরণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই বিতরণ-কার্য অর্ধ সমাপ্ত রাখিয়া ত্রস্তব্যস্ত চাউল-ডাউল মাপিয়া দুই বস্তা চাউল, এক ডালি ডাউল, এক ডালি লবণ মরিচাদি দিয়া দুইজনকে বিদায় করিল।

ভদ্রলোকদ্বয় উঠিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিয়া হামিদকে নমস্কার ও আদাব দিয়া নৌকায় উঠিলেন।

কেন্দ্রকর্তা বন্যায় উঁহাদের ক্ষতির পরিমাণ সবিস্তারে হামিদের নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন।

সেদিকে হামিদের কান ছিল না। সে স্তম্ভিতের মতো বসিয়া সম্মুখস্থ অর্ধনগ্ন নরকঙ্কালগুলির দিকে চাহিয়াছিল। তার অজ্ঞাতেই বোধ হয় তার চক্ষে অশ্রু ঠেলিয়া উঠিতেছিল।

অতিকষ্টে প্রকৃতিস্থ হইয়া হামিদ কঠোর ভাষায় কেন্দ্রকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিল: এঁদের দুইজনকে কতজনের খোরাক দিলেন?

কেন্দ্রকর্তা উৎসাহভরে বলিলেন: এঁদের বিরাট ফ্যামিলি। এতক্ষণ তবে আর বলিলাম কি আপনার কাছে? জোত-জমি বাড়িতে দালান কোঠা..... .....

বাধা দিয়া হামিদ বলিল: কই ইঁহাদের ত টিকিট চেক করিলেন না?

কেন্দ্রকর্তা বিস্মিত হইয়া বলিলেন: বলেন কি? ইঁহাদের মতো লোক কি ভাৱে ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত চাউল লইতে পারে?

হামিদ রাগ সামলাইতে পারিল না। ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে বলিল: এই সমস্ত অভুক্ত কৃষক কি ওদের ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত চাউল নেয়?

দু-এক ঘা চড়-চাপড় মারিতেছে

কেন্দ্রকর্তা অভিভাবকের মাতব্বরির স্বরে হাসিয়া বলিলেন: "আপনি রাখেন না এদের বদমায়েশির খবর। ইহারা—"

হঠাৎ গোলমালে তাঁহাদের কথোপকথনে বাধা পড়িল।

একটা বুড়ো লোক ও মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে কর্মীরা ধরিয়া টানাটানি করিয়া ওঁহাদের দিকে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্ত্রীলোকটার কাপড় ধরিয়া তিন চারটা ন্যাংটা ছেলে-মেয়ে পিছন হইতে তাহাকে টানিতেছিল এবং চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য হামিদ আসন হইতে উঠিতেই কেন্দ্রকর্তা তার জামার কোণ ধরিয়া বলিলেন: আপনি বসুন না, এখানেই ওদের লইয়া আসিবে।

হামিদ সবলে জামা ছাড়াইয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

হামিদ গিয়া দেখিল বুড়োটাকে কর্মীরা দু-এক ঘা চড়-চাপড় মারিতেছে এবং মেয়েলোকটার গলায় কাপড় লাগাইয়া টানাটানি করিতেছে।

হামিদ কাছে যাইতেই উহারা হাউমাউ করিয়া কি বলিতে চাহিল। কর্মীরা ধমক দিয়া বলিল: বেশি গোলমাল করবি তো পুলিশে দিব।

পুলিশের নাম শুনিয়া অপরাধীদ্বয় চুপ করিল। হামিদ সকলকে শান্ত হইতে বলিয়া গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

নগেন্দ্র নামক কর্মীটি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল: মিঃ ইনস্পেক্টর, ইহারা অতিশয় বদমায়েশ লোক। ইহারা টিকিটের পেন্সিলের দাগ মুছিয়া ফেলিয়া দুইবার চাউল লইয়াছে।

হামিদ কঠোর দৃষ্টিতে অপরাধীদ্বয়কে বলিল: একথা সত্যি?

উহারা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। কোনও উত্তর দিল না। হামিদের বিষম রাগ হইল! কঠোরতর স্বরে চিৎকার করিয়া বলিল: কেন এমন অন্যায় কাজ করিলে উত্তর দাও :

জওয়াবে হতভাগ্য ও হতভাগিনী ভয়ে কাঁপিতে-কাঁপিতে যা বলিল, তার সারমর্ম এই যে, তাদের এত পোষ্য এবং তাদের এত ক্ষুধা যে, যে চাউল তাদের দেওয়া হয়, তাদের পেটের এক কোণাও ভরে না। তাই নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাহারা এই ফন্দি বাহির করিয়াছে।

কেন্দ্রকর্তা বিজয় গৌরবে হামিদের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং অপরাধীদের দিকে চাহিয়া মেঘ গর্জনে আদেশ করিলেন: এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আগামী দুইদিন তোমাদিগকে কোনও সাহায্য দেওয়া হইবে না।

নগেন্দ্র অপরাধীদ্বয়ের টিকিটে কাল দুইটি করিয়া দাগ দিয়া তাহাদের টিকিট ফিরাইয়া দিল।

দণ্ডিত হতভাগ্যদ্বয় মাথা নিচু করিয়া কম্পিত পদে চলিয়া গেল। অন্যান্য সাহায্য প্রার্থীরাও তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া সমস্বরে অনেক টিট্‌কারী দিল। কেহ-কেহ অশ্রাব্য গালি-গালাজও দিল।

(৮)

কৃষকদের এই নীচতায় হামিদ ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু সেবা কার্যে চাষা–ভদ্রলোক পার্থক্য করা হইতেছে, ইহাতেও সে খানিকটা মনঃপীড়া বোধ করিল।

কেন্দ্রীয় সমিতিতে ইহার কোন প্রতিকার করা যায় কিনা দেখিবার জন্য হামিদ একদিনের জন্য সদরে ফিরিয়া আসিল।

সমিতির অফিসে গিয়া সে দেখিল, নেতারা সভা করিতেছেন। হামিদকে দেখিয়া সকলে আহলাদ প্রকাশ করলেন এবং সভাশেষে সেবা-কার্যের বিবরণ শুনিবেন বলিলেন। হামিদ নীরবে সভাগৃহে বসিয়া সভার কার্য দেখিতে লাগিল এবং সভাশেষে নিজের বক্তব্য নিবেদন করিল।

সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে এই একটি প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হইল যে মিডল ক্লাস ভদ্রলোকদের সাহায্য করিবার জন্য স্বতন্ত্র ফাণ্ড খোলা হউক এবং মিডল ক্লাস ভদ্রলোকদের নিকট প্রাপ্ত সমস্ত টাকা দুস্থ মিডল ক্লাস-ভদ্রলোকদের সেবা-কার্যের জন্য ইয়ারমার্ক করিয়া রাখা হউক।

ইহার পর নিজের বক্তব্য সভার কাছে উপস্থিত করিবার প্রবৃত্তি আর হামিদের রইল না। হামিদ সেই দিনই রিলিফ কেন্দ্রে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে সমস্ত সাহায্যপ্রার্থী যথারীতি কাতার করিয়া জমা হইল। কাতারের মধ্যে গতকল্যকার দণ্ডিত অপরাধীদ্বয়কেও দেখা গেল।

কেন্দ্রকর্তার আদেশে উহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইল; হামিদের সুপারিশের উত্তরে কেন্দ্রকর্তা বলিলেন যে, তিনি কোনক্রমেই ডিসিপ্লিন ভাংগিতে প্রস্তুত নহেন।

দণ্ডিত অপরাধীদ্বয় ক্ষুধার্ত পুত্র-কন্যাসহ চোখের পানি মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

অন্যান্য সাহায্য-প্রার্থী আগের দিনের মতো আর টিটকারি দিলো না, বরঞ্চ সকলেই গোপনে গোপনে এক-আধটু সহানুভূতি দেখাইল এবং ভারাক্রান্ত মনে বিদায় হইল।

তৃতীয় দিনও অপরাধীদ্বয় আসিয়া কাতারের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু তাদের নির্বোধ ছেলে-মেয়ের জন্য অধিকক্ষণ লুকাইয়া থাকিতে পারিল না, ধরা পড়িল। কর্মীরা তাহাদিগকে কিল-ঘুষি দিয়া বাহির করিয়া দিল। অপর সাহায্য প্রার্থীদের অনেকে তাহাদের হইয়া অনুনয় বিনয় করিল, কেহ সুপারিশ করিল। কথাবার্তায় জানা গেল যে, আগেকারদিন উহাদিগকে সাহায্য না দেওয়ায় অন্যান্য সকলের অসুবিধা হইয়াছে, কেননা অন্যান্য সকলে তাহাদের ভাগ হইতে কিছু কিছু দিয়া উহাদিগকে খাওয়াইয়াছে। অভুক্ত নাবালক শিশু কন্যাগুলিকে অনাহারে রাখিয়া তাহারাই বা পেটে ভাত দেয় কি করিয়া।

ভিখারীদের এই দাতাগিরির জন্য কেন্দ্রকর্তা রাগে অগ্নিশর্মা হইলেন। উপস্থিত সমস্ত সাহায্য-প্রার্থীকে মুখ ভেংচায়া গালি দিয়া তিনি বলিলেন: বেটারা ভিক্ষার চাউল দিয়া আবার দানছত্র খুলিয়াছিস? চোরকে যারা সাহায্য করিয়াছে, সে সব বেটা চোর। কোনও বেটাকেই আজ আর সাহায্য দিব না।

সেদিনকার বিতরণ বন্ধ হইয়া গেল। সমবেত সাহায্য-প্রার্থীরা অনেক অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। কেন্দ্রকর্তা হামিদের অনুরোধেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বদলাইতে রাজি হইলেন না। অবশেষে জনতার গলায় প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়া উঠিল। ভদ্রলোকদের খাতির করা হয়, গরীবের সামান্য অপরাধও মাফ করা হয় না, ইত্যাদির কথা জনতার মধ্য হইতে শোনা যাইতে লাগিল। কেন্দ্রকর্তার ধৈর্যের বাঁধ ভাংগিয়া গেল। জোরে চিৎকার করিয়া তিনি চাউলের বস্তা তাম্বুতে তুলিবার আদেশ দিলেন। হামিদকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া তিনি তাকে একরূপ জোর করিয়া তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেলেন। কি কর্তব্য কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হামিদও অগত্যা কেন্দ্রকর্তার সঙ্গে তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল।

হামিদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্রকর্তার হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আবার কিসের গণ্ডগোল? জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, সাহায্য না পাওয়ায় মাঝিরা আজ আর মাছ দিয়া যায় নাই। কাজেই কর্মীদের জন্য আজ আলু ভর্তা আর ডাল ছাড়া কিছু রান্না করা হয় নাই। ইহাতেই কেন্দ্রকর্তার এই রাগারাগি ও হাঁকাহাঁকি।

খাওয়ার আয়োজনও ভাল ছিল না। হামিদেরও ক্ষুধা ছিল না। কাজেই বিশেষ কিছু না খাইয়াই হামিদ তাম্বুর বাহির হইয়া পল্লীতে প্রবেশ করিল। দেখিল অভুক্ত

কৃষকেরা এক-এক জায়গায় জটলা করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। হামিদকে দেখিয়াই সকলে ছত্রভংগ হইয়া পড়িল। হামিদের অনেক ডাকাডাকিতেও কেহ সাড়া দিল না।

মনটা তার অত্যন্ত খারাপ ছিল। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় তাম্বুতে ফিরিয়া দেখিল, কর্মীরা আন্ডা রুটি ও চা লইয়া মাতিয়া গিয়াছে। হামিদ নিঃশব্দে নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(৯)

হঠাৎ কোলাহলে হামিদের ঘুম ভাংগিয়া গেল। 'চোর' 'ডাকাত' ইত্যাদি চেঁচামেঁচি ও কান্নাকাটি তার কানে গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিল। প্রায় সকলেরই কাছে রিলিফ কমিটির টাকায় কেনা এক একটা এভার-রেডি ব্যাটারিসহ গ্রীনউইচ টর্চ লাইট ছিল। হামিদকেও একটা দেওয়া হইয়াছিল। টর্চ লাইটের আলো ফেলিয়া তাম্বুও তাহার চতুর্দিক আলোকিত করা হইল। দেখা গেল ১০/১৫ জন অর্ধনগ্ন লোক এক-এক বস্তা চাউল মাথায় লইয়া যথাশক্তি দ্রুতগতিতে এদিক ওদিক পালাইতেছে।

কর্মীরা ছিল কংগ্রেসের ড্রিল-করা ভলান্টিয়ার। তাদের অনেকে আবার ডনগির কুস্তিগির ও যুযুৎসুবিদ। পক্ষান্তরে পাড়াগাঁয়ের এই চোরেরা ছিল অনেক দিনের ক্ষুধিত সুতরাং দুর্বল। তারপর চাউলের বস্তা তাদের মাথায় ছিল। কাজেই অল্পক্ষণেই তাদের অনেকেই ধরা পড়িল।

রাত্রেই থানায় খবর দেওয়া হইল। দারোগা সাহেব একপাল পুলিশসহ অকুস্থলে হাজির হইলেন। ধৃত আসামীদিগকে আচ্ছা করিয়া সাপমারা মার দিলেন। মারের চোটে পলায়িত চোরদেরও নাম বাহির হইল।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই মধুপুর গ্রামের শতাধিক ছেলেবুড়াকে হাত কড়া পরা অবস্থায় রিলিফ কমিটির তাম্বুর সম্মুখে জমা করা হইল। দারোগা সাহেব সাড়ম্বরে হামিদদের সকলের জবানবন্দি গ্রহণ করিলেন। জবানবন্দি শেষ করিয়া এক পাল অভুক্ত অর্ধনগ্ন নরকংকালকে ভেড়ার পালের মতো খেদাইয়া থানার দিকে লইয়া গেলেন।

বিচারে শতাধিক লোকের কারাদন্ডের আদেশ হইল। রিলিফ কার্যের ন্যায় পবিত্র ধর্মকার্যে বাধাদানকারী এই সমস্ত নরপিশাচের বিচার দেখিবার জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, রিলিফ কমিটির সমস্ত মাতব্বর সদস্য ও শতাধিক ভলান্টিয়ার আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। হাকিমের রায় হওয়া মাত্র তাঁহারা সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন: জয় রিলিফ কমিটি কি জয়।

সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রায় সকলেই ভদ্রলোক। কাজেই এই নরপিশাচদের নীচতায় সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। দণ্ডিত নরপিশাচেরা পুলিশের ব্যাটনের মুখে অধোবদনে জেলে চলিয়া গেল।

সেইদিনই হামিদ রিলিফ কমিটির সদস্যপদে ইস্তফা দিয়া অফিসের কাজে যোগদান করিল।

১ ভদ্র– ১৩৩৮

(১)

ভারতবর্ষ দেশটা ছিল বরাবরই উর্বর। এ দেশের মাটিও ছিল আগে থেকেই খুব লায়েক। আমরা ইচ্ছা করলেই বে-এন্তেহা ফসল আবাদ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা এতদিন ইচ্ছেই করিনি, ইচ্ছেটা আমাদের হলো না দুটো কারণে। প্রথমতঃ বেশি ফসল আবাদ করার দরকার ছিল না; দ্বিতীয়তঃ বেশি রকম ফসল আবাদ করা আইনসংগত ছিল না। দরকার ছিল না এই জন্য যে, এদেশে বেশি ফসল হলে বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যেতো। এটা ঠিক হতো না, কারণ ভারতবর্ষ ধলা আদমিদের মার্কেট-বাংলা ভাষায় যাকে বলা হয় বাজার। বাজারটা হচ্ছে গিয়ে বেচাকেনার জায়গা। বাজারে ফসল আবাদ হয়, কে কবে শুনেছেন। ভদ্দরলোকদের সুবিধের জন্য ধানক্ষেত ভেংগে বাজার বসানো নতুনও নয়, অন্যায়ও নয়।

অতএব ভারতবর্ষ স্বভাবতই এবং আইনানুসারেই ভাল মনুষদের বাজার হয়েই থাকলো—চাষা ভুষাদের আবাদের ক্ষেত হতে পারলো না।

ভালোয় ভালোয় যাচ্ছিল দিন কেটেই; অসুবিধা হলো লড়াই বেধে। বাধবি তো বাধ একেবারে চারদিকে। কর্তারা অর্থাৎ ভদ্দরলোকেরা হয়ে গেলেন ঐ যাকে বলে একেবারে ল্যাজে-গোবরে। কোন দিক ফেলে কোন দিক সামলান? ঘোমটা টানতে গেলে পিঠ বেরিয়ে পড়ে, পিঠ ঢাকতে গেলে মুখ দেখা যায়। মাল পাওয়া গেলে জাহাজ পাওয়া যায় না; আর জাহাজ পাওয়া গেলে মাল পাওয়া যায় না। যদি এ দুটো পাওয়া যায়, তবে গাড়ি পাওয়া যায় না। কষ্টে-সৃষ্টে যদি বা তিনটার যোগাড় হয়ও, তবুও ল্যাঠা চুকে না।

কারণ ভাল মানুষেরা ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছেন শুধু মার্কেটরূপে। মার্কেট ছাড়া আর কোনই ভূমিকা নেই, তার দরকারও নেই তাই সাদা ভাল মানুষেরা যখন দোকান

ফেলে গেলেন লড়াই করতে তখন বেচারী ভারতবর্ষ হয়ে উঠলো সাদার অভাবে কালা বাজার-ভদ্দরলোকের ভাষায় 'ব্লাক মার্কেট'।

'ব্ল্যাক' মানে কালো, কালো মানে অন্ধকার। অন্ধকারে জিনিস হারাবে না তো কি? সুতরাং ফসল-টসল যা কিছু হলো বা এলো সব অন্ধকারে হারিয়ে যেতে লাগল। খোরাকের অভাবে লোকজন মরতে লাগল; আর পোশাকের অভাবে মরতে লাগল লজ্জা-শরম। অথচ এ দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে। লোকজন না থাকলে লড়াই চলে না আর লজ্জা-শরম না থাকলে সত্য কথা বেরিয়ে পড়ে।

কাজেই ভদ্দরলোকেরা ঠিক করলেন, যে করেই হোক ভারতবর্ষের লোকজনকে এবং তাদের লজ্জা শরমকে অন্ততঃ লড়াইর আমলটা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতেই হবে।

কিন্তু নিজেরা কোন উপায় বের করতে পারলেন না।

অতএব তাঁরা গান্ধীজির পিছন ধরলেন। ধরলেন মানে ঠিক ধরলেন না–ধরালেন। গান্ধীজি বলেছিলেন: নিজের ক্ষেতে তুলার চাষ কর, নিজের চরকায় (অবশ্য তেল দেবার পর) সূতা কাটো, নিজের তাঁতে কাপড় বুনে তাই পরো: এ যদি করতে পার, তবে 'ব্ল্যাক' বা 'হোয়াইট' কোনো মার্কেটই থাকবে না।

গান্ধীজী কথাটা বলেছিলেন অনেক আগেই, কিন্তু ভালমানুষেরা এতদিন তা খেয়াল করেননি। কারণ খেয়াল করার কোনো দরকার ছিল না। বিনা প্রয়োজনে কোনো কাজ না করার কথাই মিল্ সাহেব বলে গিয়েছেন কি না।

কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিল। ভারতবাসীর জানের জন্যই জান বাঁচানো দরকার হোক আর না হোক, লড়াইর জন্য দরকার। এ ছাড়া ভারতবাসীরা দলে দলে মরে গিয়ে দেশের আবহাওয়া খারাপ করছে এবং তাতে ভদ্দরলোকদের এদেশে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এ বিপদ দূর করা নিশ্চয়ই দরকার।

তাই ভদ্দরলোকেরা গান্ধীজীর অনুকরণে বললেন: সবাই নিজের খাবার যোগাড় কর। গ্রো মোর ফুড- আরো খাবার ফলাও।

কথাটা সবারই পছন্দ হল। কারণ কথাটা সত্য। কথাটা সহজও। সবাই যদি ফুড মোর গ্রো করে, তবে মোটের উপর দেশে আগের চেয়ে বেশি খাদ্য উৎপন্ন হবে, এটা সোজা কথা।

সত্য কথারই প্রচার দরকার। মিথ্যা কথার প্রচার দরকার নেই। কারণ মিথ্যা কথা নিজেই প্রচারিত হয়, বিশ্বাস করে তা সকলে। সত্য কথা কেউ বিশ্বাসও করতে চায় না। সত্য কথা যদি আবার সহজ হয় তবে আরো মুশকিল। লোকের বুদ্ধি এখন বেড়েছে, তাই সহজ কথা তারা বুঝতে পারে না। কামান দিয়ে মশা মারা যায় না, এরোপ্লেনে চড়ে পাড়া বেড়ানো যায় না। তলওয়ার দিয়ে শাক পলা যায় না। তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে মোটা কথা বোঝা যায় না।

তাই গ্রো মোর ফুডের প্রচার দরকার হল। কিন্তু এই সহজ সত্য ও মোটা কথা প্রচারের জন্য মোটা বুদ্ধির লোক চাই। কাজেই সরকার বাহাদুর বেছে-বেছে কয়টি

মাথামোটা লোক যোগাড় করলেন। তাঁদের উপর প্রচারের আয়োজনের ভার দেওয়া হল। তাঁরা ততোধিক মোটা মাথার লোকের সন্ধানে খবরের কাগজে ইশ্‌তাহার দিলেন এবং দরখাস্তের অপেক্ষায় অফিস খুলে বসলেন। বিজ্ঞাপনের পুনশ্চের মধ্যে একথা লিখতে ভুল হল না যে, চাকরি-প্রার্থীগণের যাঁর মাথা যত মোটা হবে, তাঁর বেতনও অনুপাতে তত মোটা হবে।

স্বর্গীয় মহারাজা হবুচন্দ্র রাজাই ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অত টাকাওয়ালা রাজা ছিলেন না; কারণ কাগজের টাকা তখনো বেরোয়নি: তাই মহারাজার মন্ত্রী গবুচন্দ্রের মাইনেটাও বেশি ছিল না।

এটা বুঝা গেল 'গ্রো মোর ফুডের' কর্মচারী নিয়োগের এড্‌ভার-টাইসমেন্টের বেলায়। 'গ্রো মোর ফুডের' প্রচারকদের মাইনের পরিমাণটা শুনে মন্ত্রী গবুচন্দ্র হাজার বছরের বিছনা ছেড়ে গা মোড়া দিয়ে উঠে বসলেন।

রাজাও পাশেই ঘুমুচ্ছিলেন। কতকটা শরমের খাতিরে, কতকটা রাজার ঘুমের ব্যাঘাত না জন্মাবার ইচ্ছেয়, মন্ত্রী গবুচন্দ্র চুপি-চুপি উঠে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু রাজা খপ্‌ করে মন্ত্রীর হাত ধরে ফেললেন। বললেন: কোথা যাচ্ছ মন্ত্রী আমায় ফেলে?

মন্ত্রী বেকায়দায় পড়ে মনের কথা খুলেই বললেন। কারণ মন্ত্রী হলেই মিছে কথা বলতে হবে, গবুচন্দ্রের আমলে সে নিয়ম ছিল না।

গবুচন্দ্রের ইচ্ছের কথা শুনে রাজা হবুচন্দ্র মন্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন: চাকরির কথা শুনে অবধি আমার ঘুম হচ্ছিল না। শুয়ে-শুয়ে একথাই ভাবছিলুম। ভালই হল। চল, দু'জনেই চাক্‌রির দরখাস্ত করি।

করলেনও তাঁরা দরখাস্ত। চাক্‌রি হলও তাঁদের। শুধু হল না; পরীক্ষায় তাঁদেরই বুদ্ধি সবচাইতে মোটা প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের মাইনেটা সবচাইতে মোটা হল। প্রোপাগাণ্ডার আয়োজন-ইন্তেজামের ভারও তাঁদেরই উপর পড়ল।

(২)

রমেশ ও রশিদ দুই বন্ধু।

রমেশ কেমিস্ট্রি দর্শন ও সংস্কৃতে তিনটা ফার্স্ট ক্লাশ এম. এ. পাশ করে অবশেষে তিন এগারং তেত্রিশ টাকা মাইনেয় এক ব্যাংকে কেরানিগিরি করছে আজ নয় বৎসর যাবৎ।

আর রশিদ আরবীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর ত্রিশ টাকা মাইনেয় এক স্কুলের মাস্টারি করছে। সম্প্রতি তার এক আত্মীয় এম. এল. এ. সরকার-বিরোধী দল ছেড়ে মন্ত্রী-দলে যোগ দিয়ে রশিদকে এক গাঁজার দোকান নিয়ে দিয়েছেন। দোকানের আয় মাসে প্রায় একশ' টাকা। এম. এল. এ সাহেবকে অর্ধেক দিতে হয়। রশিদের থাকে পঞ্চাশ টাকা।

দুই বন্ধুর চলে যাচ্ছিল কোনোমতে। কিন্তু লড়াইর অজুহাতে জিনিসপত্রের দাম চড়ে যাওয়ায় বন্ধুদ্বয়ের সংসারে টানাটানি দেখা দিয়েছে।

রশিদের দোকানের সামনে সরকারী রাস্তার ওপর লোহার চেয়ার পেতে বসে দুই বন্ধুতে সেই আলোচনাই হচ্ছিল। যুদ্ধের অবস্থার আলোচনা, চার্চিল হিটলার স্টালিন রুজভেল্টের নির্বুদ্ধিতার তুলনামূলক সমলোচনা, মার্কিন জাপানের নৌ-বহরের শক্তির পরিমাপ ইত্যাদি ছোটখাট বিষয়ে, নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমতাদি প্রকাশ করার পর বন্ধুদ্বয় ঘরের কাছে দুর্ভিক্ষের দিকে নজর ফেরাল। দুর্ভিক্ষের আলোচনা থেকে তারা চট করে চালের দামে এবং সেখান থেকে একে বারে 'গ্রো মোর ফুড' স্কিমে নেমে আসল।

রমেশ বলল: ফসল বাড়াবার চেষ্টা না করে সরকার যদি নোটের সংখ্যা বাড়াবার দিকে মন দেয়, তবে অনেক সমস্যা মিটে যেতে পারে।

রশিদ বলল: ব্যাংকের চাকরি কর কিনা, কথায় কথায় নোটের কথা টেনে আন। নোট বাড়ালে সমস্যা সমাধান হবে, না ছাই হবে। তার চেয়ে গাঁজার আবাদ বাড়াও। ভাত ছেড়ে সবাই গাঁজা ধরো। কোনো সমস্যাই থাকবে না।

রমেশ হেসে বলল: তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। শুনছি হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রী শ্মশান থেকে উঠে এসে 'গ্রো মোর ফুডে'র ভার নিয়েছে। ওরা গাঁজার আবাদ বাড়ানো ছাড়া করবে কি? তোমার দোকানের বিযিনেস বেড়ে যাবে রশিদ। তোমার কপাল ভাল।

রশিদ : তা ও বেচারাদেরই বা দোষ কি? যা মাইনের ব্যবস্থা করেছে, তাতে শ্মশান তো শ্মশান, পাতাল থেকে উঠে এসে চাকরি নিতে হয়। তা যাই বল রমেশ, দেশের খাদ্য-সমস্যা মিটুক আর নাই মিটুক, ঐ ডিপার্টমেন্টের চাকরদের সমস্যা কিন্তু নিশ্চয় মিট্‌বে।

হঠাৎ রমেশ লাফিয়ে উঠে বলল: ভাল কথা এই দফতরে চাকরি নিলে কেমন হয়? করবে দরখাস্ত?

বলে সোৎসাহে রমেশ পকেট থেকে দুটো বিড়ি বের করে একটা রশিদকে দিল আরেকটা নিজের মুখে গুঁজল। তারপর দেশলাইর জন্য রশিদের দিকে হাত বাড়াল।

রশিদ কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে বলল: সে গুড়েবালি। হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রী যে দফতরের হয়েছে কর্তা, সেখানে পেতে চাও চাকরি? যেমন বুদ্ধি তোমার। ও দফতর থাকবে ক'দিন? আর আমাদের মতো চিকন-বুদ্ধির লোক ওরা নেবেই বা কেন?

রমেশ হেসে বলল: এই জন্যই তো বেশি করে নেবে। আমরা চিকন বুদ্ধির লোক জানতে পারলে আমাদের নেবে না এটা ঠিক। কিন্তু তা ঐ মোটা-বুদ্ধির লোকেরা বুঝবে কি করে?

রমেশের যুক্তি রশিদের মনে লাগল।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে তখনি চাকরির দরখাস্তের মুসাবিদে করে ফেলল। উভয়ের দরখাস্তেই লেখা হলো যে তার মতো নির্বোধ সে অঞ্চলে আর দুটো নেই। কি করে রশিদ একদা পাজামার এক পায়ে দু-পা ঠেলে দিয়ে সারাদিন বাড়িশুদ্ধ তার অপর পা খুঁজে বেড়িয়েছিল, নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ রশিদের দরখাস্তে সে কথাও লিখে দেওয়া হল।

আর রমেশ কি করে একদিন 'চানে'র পরে অন্য কাপড়ের অভাবে বউয়ের শাড়ি পরে নিজেকেই নিজের বউ মনে করে আসল বউকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যস্থতায় কি করে সে সমস্যার সমাধান হয়েছিল, রমেশের দরখাস্তে সে কথা লিখে দেওয়া হল। পাছে এতেও কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে না হন, সেজন্য এক বন্ধু অপর বন্ধুর দরখাস্তে স্ট্রং রিকমেণ্ডেশন লিখে দিল। রমেশ লিখল যে, আরবীতে অনার্স নিয়ে রশিদ যে গাঁজার ভেণ্ডারী করছে, নির্বুদ্ধিতার-এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

রশিদ রমেশের দরখাস্তে লিখল যে, কেমিস্ট্রি দর্শন ও সংস্কৃতে এম. এ পাশ করে যে ব্যক্তি ব্যাংকের কেরানিগিরি করতে পারে, তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার বিচারভার কর্তৃপক্ষের বুদ্ধি-বিবেচনার উপরই রইল।

বেয়ারিং পোস্টে দরখাস্ত ডাকে দেওয়া হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই দুই বন্ধুর নিয়োগপত্র এল।

কর্তৃপক্ষ লিখেছেন : তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ স্যাটিসফায়েড হয়েছেন।

ব্যাঙ্কের চাক্‌রি ও গাঁজার দোকানের নয়া বন্দোবস্তে সময় নষ্ট না করেই দুই বন্ধু নয়া চাকরিতে যোগ দিল।

(৩)

'গ্রো মোর ফুড' দফতরের সভা।

দফতরের নব-নিযুক্ত ডাইরেক্টর মহারাজা হবুচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। ডিপুটি ডাইরেক্টর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর আমন্ত্রণে দেশের গণ্যমান্য বহু বিশেষজ্ঞ সভায় হাজির হয়েছেন।

বলাবাহুল্য বিভাগীয় সেক্রেটারি হিসাবে আমাদের রশিদ ও রমেশ কেতাদুরুস্ত ফাইল নিয়ে সভায় হাজির।

প্রাথমিক উদ্বোধন অভিনন্দনাদি হবার পর মন্ত্রী গবুচন্দ্র আসল কথা পড়লেন। তিনি বললেন: কি করে খাদ্য বেশি করে ফলান যেতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্যই আপনাদের ডাকা হয়েছে।

বাধা দিয়ে রমেশ বলল: খাদ্য ফলানোর স্কিম করবার আগে স্থির করা দরকার খাদ্য কাকে বলে।

সকলে সবিস্ময়ে রমেশের দিকে চাইলেন। কেউ কিছু বলতেও বোধ হয় যাচ্ছিলেন।

কিন্তু সভাপতি মহারাজা বলে ফেললেন: তা ত বটেই সেটা ঠিক করতেই হবে। এক-এক জনের খাদ্য এক একটা। গরু ঘাস খায়, বিল্লি দুধ খায়, কুত্তা গোশ্‌ত খায়, ছারপোকা ও মহাজন মানুষের লহু খায়। আর মানুষ সবই খায়। অধিকন্তু মানুষ মদও খায়। (রশিদ বাধা দিয়ে বলল। গাঁজাও খায় স্যার) হাঁ গাঁজাও খায়। কাজেই আমরা কোন খাদ্য বাড়াতে চাই, সেটা ঠিক করতে হবে বই কি।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বুঝলেন: কেতাব পড়ে হবুচন্দ্র সম্পর্কে তারা যে ধারণা করে রেখেছিলেন সেটা আর সত্য নয়; বিংশ শতাব্দীর হবুচন্দ্র সত্যযুগের হবুচন্দ্র নন। অনেকদিন মাটিচাপা থেকে তাঁর মগজে বুদ্ধির খনি পয়দা হয়েছে।

কিন্তু শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেদিকে গেল না। সে বলল: মাননীয় সভাপতি, আমি সেকথা বলছি না। আমি কেমিস্ট্রির কথা ফিজিওলজির কথাই বলছি। খাদ্য মানে শুধু কতকগুলি জড়পদার্থ নয়। খাদ্যপ্রাণ দিয়েই খাদ্যের বিচার করতে হবে। খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন চাই, ভিটামিন চাই, ক্যালশিয়াম চাই, কার্বোহাইড্রেট চাই। সর্বোপরি চাই অক্সিজেন হাইড্রোজেন। এই হিসাবে, বিজ্ঞানের এই বুনিয়াদে বিচার করলে হাওয়াই আমাদের প্রধান খাদ্য। বেশি করে হাওয়ার আবাদ করাও আমাদের স্কিমে স্থান পাবে কিনা সেটা জানা দরকার।

সভায় হট্টগোল বেধে গেল। অনেকেই অনেক কথা বললেন নিশ্চয়। কিন্তু কে কি বললেন বোঝা গেল না।

কি করে সভার গোলমাল মেটাতে হয় সভাপতি হবুচন্দ্রের সেটা জানা ছিল না। কারণ তাঁর আমলে তখনও সভাসমিতি ও দলাদলির রেওয়াজ হয়নি।

তাই তিনি সভাপতির আসন ছেড়ে এসে সদস্যদের জনে জনে হাতজোড় করে শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

তাতে মৌখিক গণ্ডগোল শারীরিক গোলমালে পরিণত হল।

রমেশ ছুটে গিয়ে সভাপতির কানে-কানে কি বলল। সভাপতি আসনে ফিরে গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে আঘাত করে বলতে লাগলেন। অর্ডার অর্ডার।

হট্টগোলের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল; সুতরাং সভাপতির আদেশে সভায় শান্তি হল।

সভাপতি বললেন: মিঃ রমেশচন্দ্র অন্যায় কথা কিছু বলেননি। আমাদের স্কীমে হাওয়ার চাষ করার কথাও বিবেচিত হতে পারবে; কারণ ওটাও খাদ্য।

রশিদ বেশি কিছু বলবে না মনে করে রেখেছিল। কিন্তু সভাপতি রমেশের পয়েন্ট গ্রহণ করলেন দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না, দাঁড়িয়ে বলল: সভাপতি মহোদয়, গাঁজার কি হবে?

সভাপতি : গাঁজার কি হবে মানে?

রশিদ : গাঁজার আবাদ বাড়ানো হবে কিনা? আমাদের স্কীমে তার স্থান আছে কিনা?

জনৈক সদস্য : গাঁজা খাদ্য নয়, আমি গাঁজা আবাদের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

সভাপতি : গাঁজা দরকারী খাদ্য কিনা সে সম্বন্ধে সদস্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। কাজেই রশিদ সাহেবের প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারছি না।

রশিদ : সভার ভোট নেওয়া হোক।

সভাপতি : বেশ তবে ভোটই নেওয়া হবে। বলুন আপনারা—

বাধা দিয়ে রশিদ বলল: কোন প্রস্তাব ভোটে দেওয়ার আগে প্রস্তাবককে বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়ার নিয়ম আছে।

সভাপতি সভার চারিদিকে নজর ফিরিয়ে বললেন তাই নাকি? সভার মত পেয়ে সভাপতি রশিদকে বলার অনুমতি দিলেন।
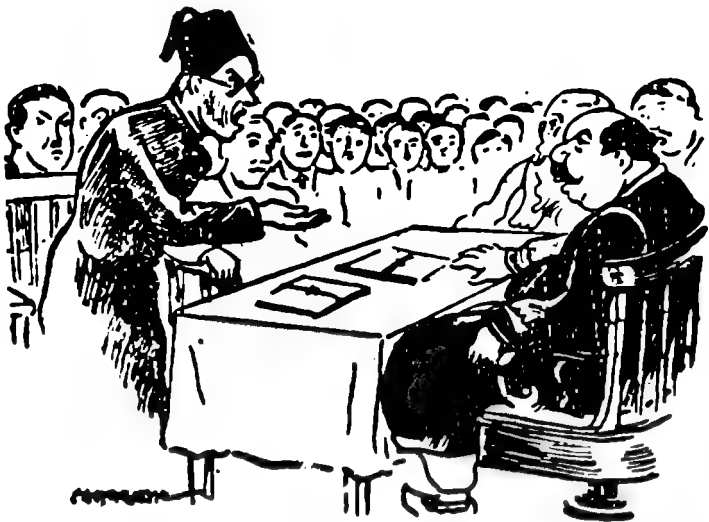
রশিদ দাঁড়িয়ে বললো: সভাপতি মহোদয়, গাঁজার কি হবে?

রশিদ বললো: কোনো-কোনো মাননীয় সদস্য বলেছেন, গাঁজা খাদ্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এমন কথা কোনো ভদ্রলোক বলতে পারেন, চোখে না দেখলে একথা আমি বিশ্বাস করতাম না। তদ্ব্যতীত দুটো ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ তাড়াতাড়ি আমাদের দেশের খাদ্য সমস্যা মেটাতে হবে। সুতরাং আমাদের সময় কম। গাঁজা অল্প সময়ে হয়। দ্বিতীয়তঃ এরোড্রোম এয়ারফিল্ড ও সৈন্যনিবাস

নির্মাণে আমাদের দেশের জমিও অনেকখানি খরচ হয়ে গেছে। সুতরাং আবাদী জায়গাও কম। গাঁজায় ধানের চেয়ে কম জায়গা লাগে। তৃতীয়তঃ জনপ্রতি খোরাকির জন্য চাল-ডাল যতটা লাগে, গাঁজা ততটা লাগে না। চতুর্থতঃ আমার শেষ কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, গাঁজায় বুদ্ধি যতটা টনটনে হয়, ভাত-রুটিতে ততটা হয় না। এক রতি গাঁজার একটি ছিলিমে একটি মাত্র দম কষলে যে ফল পাওয়া যায়, গাদা গাদা ভাত-রুটি গলায় ঠেলেও সে ফল পাওয়া যায় না। এ থেকেই আপনারা গাঁজা আবাদের সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।

সভায় করতালি পড়ল।

সভাপতি বললেন: সদস্যদের করতালিতে বোঝা গেল রশিদ সাহেবের প্রস্তাবে অধিকাংশের মত আছে। তার দরকারও ছিল না। কারণ তাঁর সারবান যুক্তি শুনে আমি আগেই স্থির করে ফেলেছি গাঁজার আবাদ আমাদের করতেই হবে।

সভার যে নিয়ম করা হয়েছে এবং সদস্যগণকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাতে সভাপতির মতে সায় দিয়ে যাওয়াই ছিল সদস্যগিরি রক্ষার একমাত্র উপায় এবং সদস্যগিরি বজায় রাখার উপর নির্ভর করছিল সদস্যগণের পেটে-ভাতের ব্যবস্থা। সুতরাং সভাপতির উক্ত মন্তব্যের পর অল্পক্ষণেই বিনা আপত্তিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হল যে, গাঁজার আবাদ বেশি করতে হবে; সেজন্য দরকার হলে চাল-ডালের আবাদ বাদ দিতে হবে।

সভায় ইংরেজ সদস্যও ছিলেন দু-চার জন। তারা আপত্তি তুললেন: শুধু গাঁজার আবাদ করলে আমরা খাব কি?

সভাপতি: সেজন্য আপনাদের কোনো ভাবনা নাই। মাননীয় ভারত সচিব বলেছেন যে, আপনাদের খাদ্য মদ আমদানির ব্যাপারে সমস্ত জাহাজ নিয়োজিত হয়েছে বলেই ভারতবাসীর চাল-ডাল আমদানির কাজে জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ইংরেজ সদস্যরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়লেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল: ইংরেজ-মার্কিনদের জন্য মদ, ভারতীয় ভদ্রলোকদের জন্য গাঁজা এবং ভারতীয় জনসাধারণের জন্য হাওয়ার চাষ করাই হবে "গ্রো মোর ফুড" আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সে মর্মে প্রস্তাবাদি গৃহীত ও নিয়মাবলী রচিত হল।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা ভঙ্গ হল।

(৪)

সন্ধ্যার অনেক পরে অফিস থেকে বাসায় ফিরে রশিদ ও রমেশ ত হেসেই কুটিকুটি।

হাসি থামলে রমেশ বলল: কেমন, বলিনি যে হবুচন্দ্র যেখানে কর্তা, সেখানে আমরা সহজেই কাজ বাগাতে পারব?

রশিদ মাতব্বরির সুরে বলল: গাঁজার ব্যাপারে আমি কাজ বাগিয়েছি বলতে পারি; কিন্তু তোমার কি হল? তুমি ত হাওয়া হাওয়া করেই মেতে উঠলে। তোমার ব্যাংকের নোটের কি করেছ বলত?

রমেশ : এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে আসো? গাঁজার আবাদ বাড়লে তোমার কি? আর নোট বাড়লেই বা আমার কি? আমাদের কাজ হল চাক্‌রি বজায় রাখা। চাক্‌রি বজায় রাখার উপায় হল 'গ্রো মোর ফুড' বিভাগের মেয়াদ বাড়ানো। ফসলের আবাদ যত বাড়বে, ফুড বিভাগের মেয়াদ তত কমবে; এটা বুঝতে পারছ না? কাজেই আমাদের স্বার্থ হল 'গ্রো মোর ফুড' আন্দোলন ব্যর্থ করে দেওয়া। কিন্তু এ-সব কথা বলবার উপায় নেই। কারণ এসব চিকন-বুদ্ধির কথা। তোমার আমার চিকন-বুদ্ধি আছে এ কথা জানতে পারলেই আমাদের চাক্‌রি যাবে, একথা ভুলে যাইও না।

রশিদ দস্তুরমতো ঘাবড়িয়ে গেল। তা হলে আমাদের কি করতে হবে?

রমেশ: করতে তোমাকে কিছু হবে না, চোখ বুজে আমায় সমর্থন করে যাইও। আমার অবাধ্য কদাচ হয়ো না। অব দাও দেখি তোমার মাইনের টাকা থেকে পাঁচশ টাকা হাওলাত। আমার এখন ভারি ঠেকা; পরে নিয়ে নিও।

রশিদ নিজের চাক্‌রি থাকা সম্পর্কে একরূপ হতাশ হয়েই গিয়েছিল। রমেশের কথা শুনে বুঝল তার চাক্‌রি বজায় রাখা একমাত্র রমেশের দ্বারাই সম্ভব কাজেই বিনা আপত্তিতে রমেশের হাতে একতোড়া নয়া নোট তুলে দিল।

রমেশ তাচ্ছিল্য করে টাকা গুণতে-গুণতে বলল: ফসলের আবাদ যাতে না বাড়ে শুধু তাই করলে চলবে না। ফসলের আবাদ কমাবার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে আমাদের চাক্‌রি আর দু'মাস মাত্র বুঝতে পারছি।

রশিদ ড্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল: বুঝতে পারছি।

রমেশ: তবে চল এখনি হবুচন্দ্রের বাসায়।

দুই বন্ধু গেল রাত্রেই হবুচন্দ্রের বাসায়।

হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রীর সংগে আলাপ শেষ করে শুতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দুই বন্ধুকে দেখে রাজা-মন্ত্রী দু'জনেই আবার বসে পড়লেন :

রাজা : তোমরা এতরাতে আবার কিসের জন্য? গাঁজা এখনি লেগেছে নাকি?

রমেশ : না হুজুর। গাঁজার আবাদই বোধ হয় করা যাবে না : আমাদের স্কীমেই ফেল হবে। দেশ বোধ হয় বাঁচাতে পারব না।

রাজা আঁৎকে উঠলেন। বল্‌লেন কি সর্বনাশ, গাঁজার চাষ হবে না! কেন?

রমেশ : কি করে হবে? প্রথমতঃ বিলাতী সরকারের হুকুম 'গ্রো মোর ফুডে'র জন্য সভা-সমিতি করতে হবে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, সেজন্য লক্ষ-লক্ষ

টাকা খরচ করতে হবে। খাদ্যফসল বাড়াও বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে দেশের লোকেরা খাদ্য ফসলেরই আবাদ করবে। গাঁজার আবাদ করবে কেন?

মন্ত্রী গবুচন্দ্র: খাদ্য-ফসলের কথা না বলে আমরা সোজাসুজি গাঁজার কথা বিজ্ঞাপনে বলে দিব।

রমেশ : তা হয় না হুজুর। বিলাতী সরকারের হুকুম খাদ্য-ফসল বাড়াও প্রচার করতে হবে।

রাজা হবুচন্দ্র : আমরা বিলাতী সরকারের অনুমতি নেব।

রমেশ : অনুমতি পাবেন না।

রাজা : কেন?

রমেশ : ইংরাজ মদখোর জাত। ওরা গাঁজার মর্ম কি বুঝে? তাছাড়া দেশী মদ তৈরি করতে চাল লাগে।

রাজা : তা হলে উপায়?

রমেশ : উপায় আছে। আপনি আদেশ দিলেই হয়।

রাজা : বল কি আদেশ দিতে হবে?

রমেশ : খাদ্য-ফসল বারাবার জন্য সভা-সমিতি করা হবে না। শুধু খবরের কাগজে ও শহরের বড়-বড় দালানের ভেতরে (বাইরে নয়) বিজ্ঞাপন দিতে হবে। পাড়াগাঁয়ের চাষা ভূষারা যাতে এ আন্দোলনের কিছুই জানতে না পারে।

রাজা : তথাস্তু! এ আদেশ দেব।

রমেশ : আমাদের চাষা ভূষারা লেখাপড়া তেমন না জানলেও মাতৃভাষা কিছু কিছু শিখেছে। কাজেই কোন দেশী ভাষার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলবে না। শুধু ইংরেজি কাগজে দিতে হবে। হ্যান্ডবিল যা ছাড়া হবে তাও ইংরেজিতে।

রাজা : তথাস্তু! তাই করা হবে।

রমেশ: চাষা-ভূষাদের আত্মীয়-স্বজন অন্ততঃ জানাশোনা লোকদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ইংরেজি জানে: লোক মুখেও অন্ততঃ তারা শুনতে পাবে। কাজেই মফস্বলে যাতে খবরের কাগজ যেতে না পারে, তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

মন্ত্রী গবুচন্দ্র : সেটা আবার কি করে করা যাবে।

রমেশ : কাগজের প্রচার জোর করে কমিয়ে দিতে হবে। দুই উপায়ে এটা করা যেতে পারে! একদিকে কাগজের সরবরাহ কমিয়ে দিতে হবে। আরেক দিকে দু'পয়সার কাগজের দাম দু'আনা করতে হবে। দু'আনা দিয়ে খাবরের কাগজ পড়বে কোন শা-?

রাজা: বেশ। তাও করা হবে। কিন্তু এতে কাজ ফতে হবে ত দেশকে খাদ্যাভাব থেকে বাঁচতে পারব ত?

রমেশ : নিশ্চয় পারবেন হুজুর। তবে আরেকটু কাজ করতে হবে।

রাজা : বলছ কি? আরো কাজ আছে?

রমেশ : সামান্য হুজুর। কাগজে পড়ুক আর নাই পড়ুক চাষীরা নিজেদের বুদ্ধিতেই ফসলের আবাদ বাড়িয়ে ফেলতে পারে। কারণ ফসলের দাম অমনি বেড়ে গেছে। দামের লোভেই চাষীরা ফসলের আবাদ বাড়িয়ে ফেলবে। গাঁজার আবাদ মারা যাবে।

রাজা : এটা ঠেকানো যায় কি করে?

রমেশ : যায় হুজুর যায়: আপনি ইচ্ছে করলেই করতে পারেন। আপনার অসাধ্য কি আছে?

রাজা : (খুশী হয়ে) বল কি উপায়ে করা যায়।

রমেশ : আপনি ঘোষণা করে দিন যে, চাষারা যে ফসল আবাদ করবে, সবই গভর্ণমেন্ট নিয়ে নেবে জোর করে; সে মর্মে শিগগির অর্ডিন্যান্স হচ্ছে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। চাষীরা ভয়েই আর ফসল আবাদ করবে না।

রাজা : ঠিক ঠিক। আচ্ছা তাই করা হবে কিন্তু এতে চারদিক রক্ষা হবে ত? দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব আমি পালন করতে পারব ত?

রমেশ : নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি না পারলে পারবে আর কোন শা–। তবে হুজুর আর একটু সামান্য কাজ করতে হবে।

রাজা (মাথা চুলকাতে চুলকাতে): এখনো তোমার ফরমাশ শেষ হয়নি। বড় ঝামেলায় পড়া গেছে এই দায়িত্ব নিয়ে।

রমেশ : বেশি কিছু নয়। এটাই আমার শেষ আরজ।

রাজা : বল।

রমেশ : ভাল-ভাল আবাদযোগ্য জায়গায় যাতে চাষীরা যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরুন, আসাম প্রদেশের পতিত জমি। এতে যদি চাষীরা একবার ঢুকতে পারে, তবে ধান সর্ষে ডাল দিয়ে তারা দেশ ছেয়ে ফেলবে। গাঁজা আবাদের আর কোন চান্স থাকবে না। খুঁটিগাড়ি আইন করে এগুলো সরকারের রিজার্ভ ঘোষণা করতে হবে। আর সর্বশেষ চাষীদের চলাফেরা বন্ধ করার জন্যে নৌকা-টৌকাগুলো ডিনায়েল পলিসি–

রাজা : আমার বড্ড ঘুম লেগেছে, আর শুনতে পারি না। তোমার যা যা দরকার আইন করে ফেল, কাল সকালে আমার দস্তখত নিয়ে নিও। এখন যাও।

পরদিন তাই হলো।

"গ্রো মোর ফুডে"র বীজ বুনা হয়েছে। বাছাই-নিড়ানী চলছে। এখন শুধু মাড়াই এর অপেক্ষা!

১ অগ্রহায়ণ–১৩৫০

ফুড কন্‌ফারেন্স–৬

(ক)

হিন্দুর পূজা।

মুসলমানদের ঈদ।

বিশ্ব-যুদ্ধে গণতন্ত্রের জয়।

চারদিকেই খুশীর খবর। সুতরাং সারাদেশ আনন্দে মেতে উঠবার কথা।

আমিও আনন্দে মেতে উঠবার চেষ্টা করলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই গুনগুন করে গান ধরলাম:

রমজানের অই রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।

গানে জুৎ ধরল না। গলা খুলল না। তার বদলে খুস্‌খুসানিতে কাশি এল। মনে পড়ল নজরুল ইসলামের কবিতা:

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসেনি নিদ।

আধ-মরা সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?

তাই-ত দেখছি। দেশে এত বড় আকাল হয়ে গেল। লাখ লাখ লোক মারা গেল। যারা বেঁচে রইল, তারাও না খেতে পেয়ে হল কংকাল-সার! তাই কি ঈদের আনন্দে মন গরম হয়ে উঠছে না?

কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অফিসের সহকর্মী পরেশদা বুদ্ধিমান লোক। টাকা ধার না পেলেও আপদে-বিপদে তার কাছে বুদ্ধি ধার পেয়ে থাকি।

তাই গেলাম তার কাছে।

দেখলাম জুতা-জামা পড়ে সেও বৈঠকখানায় বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। আর গুন্‌গুন্ করে গাইছে:

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।

আমায় দেখে পরেশদা শুকনো হাসি হেসে বলল: কি বলিস ভায়া, সত্যি কি আনন্দে দেশ ছেয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে?

পরেশদার মনেও সেই সন্দেহ! তবে ত ওর দশা আমারই মতো।

বললাম : ছেয়েছে দেশ কিছু একটাতে নিশ্চয়ই-কিন্তু সেটা আনন্দে কি বিষাদে, তা ত বুঝতে পারছি না, পরেশদা!

পরেশ : যা বলেছিস ভাই। কোথায় আনন্দ? লাখ-লাখ দেশবাসী না খেতে পেয়ে মরে গেল, আর তাদেরই শ্মশানের উপর দাঁড়িয়ে কি না করব আমরা পূজা ও ঈদের আনন্দ? আমার মন কিছুতেই এ-সবে বসছে না। তাছাড়া বাজারে ত আগুন। কিছু কেনবার জো আছে? ত্রিশ টাকার কমে একখানা তাঁতের শাড়িও কেনবার উপায় নেই। তিনটি টাকা না হলে একখানা ছোট হাফ্ প্যান্টেও হাত দেওয়া যায় না।

তাই বল। টাকার প্রেমটাই বড়, দেশপ্রেমটা শুধু লোক দেখানো।

–বলতে বলতে বউদি অগ্নিমূর্তিতে ঘরে ঢুকলেন। বলতে লাগলেন: আড়াল থেকে তোমাদের কথাবার্তা সব শুনেছি। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে, সেটা কি আমার দোষ? আমি কি কারো পাতের ভাত কেড়ে এনেছি? তবে তার জন্য আমায় শাস্তি দেওয়া কেন 'বাজার আগুন' 'বাজার আগুন' বলে ত দু'বছরের মধ্যে এক সুতো কাপড় দাওনি। এই পুজোটাও ফাঁকি দিয়েই নিবে? দাও কপালে আমার এতও ছিল!

–বলতে বলতে বউদি যেমন বেগে এসেছিলেন,তার দ্বিগুণ বেগে বেরিয়ে গেলেন।

পরেশদা আমার দিকে চেয়ে বললেন: দেখলে ত ভায়া বিয়ে করে দেশের কথা ভাবা যায় না! চল, বাজার করতেই হবে।

আমি বললাম : দাদা, সারা শহর ঘুরে-ঘুরে ফুটপাত থেকে সবচেয়ে সস্তা দামের জিনিস কিনে আনব।

পরেশ : আরে কিনব ত ফুটপাত থেকেই। ফুটপাত নয় ত কি হোয়াইট– এও এতে যাব? ফুটপাতেও ত নির্ঘাত পঞ্চাশটা টাকা ফেলতে হবে।

আমি : তা হোক। বাড়িতে এসে বলব সত্তর টাকা।

পরেশ : সত্তর নয়–পঁচানব্বই। কিন্তু যাবে ত নগদ পঞ্চাশ টাকা।

(খ)

রাস্তায় বেরুলাম।

কাতারে–কাতারে লোক ঈদ ও পূজার বাজার করতে বেরিয়েছে।

সবাই বাজার আক্‌কারার কথা বলছে। কিন্তু মৃত দেশবাসীর কথা কারো মুখে শুনলাম না।

রাস্তায় সবার উপর আমাদের দুই বন্ধুর মন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

পরেশ বলল: আজ ঈদ ও পূজা না হয়ে যদি মোহর্‌রম হত, তবেই মানাত ভাল ঈদের জামাত ও পূজোর মিছিল না করে বাংগালিরা যদি আজ মহর্‌রমের মিছিল বের করত, ঈদ ও পূজোর নতুন কাপড়ের বদলে বাঙ্গালি জাতটা যদি আজ কালো শোক বস্ত্র পরে খালি পায়ে, 'হায় কি হল' বলে বুকে করাঘাত করতে করতে রাস্তায় বেরুত, তবে সত্যি বলছি ভাই, আমি তাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাতাম।

পরেশদার উদ্ভট কল্পনায় আমার হাসি পেল। কিন্তু হাসলাম না। ওটা নিষ্ঠুরতা বলে মনে হল।

তাই গলায় দরদ মাখিয়ে বললাম: আমার মনের কথাটাই বলেছ দাদা। কিন্তু হতভাগ্য দেশে কি মানুষ আছে।

মানুষ আছে কি নাই, পরেশদা বোধ হয় তারই হিসেব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। অদূরে শানাই বেজে উঠল। শানাইর কান্নার সুরে আমাদের দুই বন্ধুর চোখের কোণে পানি জমা হল।

পরেশদা আমার দিকে চেয়ে বলল : ঐ শোন্ কোন হতভাগা আবার বিয়ে করছে। দেশের লোক না খেয়ে মরে গেল, আর তাদের শবের উপর দাঁড়িয়ে হতভাগারা বিয়ে করছে! বিয়ের মুখে মারি ঝাঁটা।

পরেশদার মনের আয়নায় নিশ্চয় বউদির মুখের ছবি পড়েছিল।

আমি বললাম: ওটা বিয়ে নয় পরেশদা, মহর্‌রমের একতালা বাজনা হচ্ছে। ঐ শোন 'হায় হাসান' 'হায় হোসেন' ও শোনা যাচ্ছে!

'তবে কি সত্যই মহর্‌রমের মিছিল?'—আনন্দে পরেশদার গলা গদ গদ হয়ে উঠল। সে আমার হাত ধরে জোরে টেনে ঐ দিকে ছুটল'।

ক্রমে আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখা গেল সত্যই মহর্‌রমের মিছিল। ঢাক-ঢোলের আওয়াজ ছাপিয়ে ছাতপেটার শব্দের মতই ছাতিপেটার শব্দ হচ্ছিল। 'হায় হাসান' 'হায় হোসেন' শব্দ আসমানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মিছিলকারীদের সবার পরনে কাল কাপড়। খালি পা।

পরেশদা আমার মুখের দিকে চাইল। আনন্দের আতিশয্যে এক ঝাঁকিতে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে জোড়হাতে মিছিলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করল।

বলল : বাঙ্গালি আজো মরে নি।

আনন্দে দুই বন্ধু এগিয়ে গেলাম।

মিছিল আরো কাছে এল। আওয়াজ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শোনলাম : মিছিলের লোকেরা ছাতিপেটা করে যা বলছে, তা 'হায় হাসান' 'হায় হোসেন' নয়; তারা বলছে : 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান' 'হায় জাপান'—'হায়—!'

আমরা অবাক হলাম। দুই বন্ধু আমরা এ-ওর দিকে চাইলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না কেউ। এরা সব করছে কি? জাপান ও জার্মানের জন্য এরা রোদন করছে কেন? বেটাদের মতলবটা কি?

একটা ভুঁড়িওয়ালা লাফিয়ে-লাফিয়ে ছাতিপেটা করে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল: তাই সে মিছিল থেকে একটু আলগা হয়ে পড়েছিল।

আমি তার কাছে গিয়ে পুছ করলাম: আপনারা এ-সব কি বলছেন? জাপান-জার্মানের জন্য এমন রোদন করছেন কেন? আপনারা কে?

উত্তরে ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে কি বলল বোঝা গেল না। আঙুল দিয়ে আমাদের দৃষ্টি তাদের নিশানের দিকে ফেরাল।

আমরা দেখলাম লেখা রয়েছে অল-ইণ্ডিয়া চেম্বার-অব মার্চেন্টস। কিছুই বুঝলাম না।

মিছিল এগিয়ে চলল: আমরা অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে রইলাম।

একদল শেষ হতে না-হতেই আরেক দল ঐরূপ 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান' বলে ছাতিপেটা করতে করতে এগিয়ে এল।

দেখলাম ওদের নিশানে লেখা রয়েছে: অল-বেঙ্গল এ. আর. পি. ওয়ার্কার্স লীগ।

তার বাদে একদলের পর আরেক দল করে ক্রমে ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রাক্টর্স এসোসিয়েশন' বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল সিভিল সাপ্লাই এমপ্লয়িজ 'রিলিফ কমিটি' 'অল-ইণ্ডিয়া এম. এল. এ. প্রটেকশন লীগ' ইত্যাদি অনেক নিশান আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বায়স্কোপের ছবির মতো পার হয়ে গেল।

হাজার-হাজার লোকের মিছিল।

সকলের মুখে ঐ এক ধ্বনি 'হায় জাপান' হায় জার্মান।

(গ)

মিছিল যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আমার হুশ হল। ফিরে পরেশদার দিকে তাকালাম।

বললাম : কিছু বুঝতে পারলে পরেশদা?

পরেশদা বিস্ময়-কম্পিত গলায় বলল: আমার ত মনে হয় বেটারা পঞ্চম বাহিনীর লোক, তুমি কি বল?

আমি লাফিয়ে উঠলাম: ঠিক বলেছ দাদা। এরা ফিফ্‌থ্ কলাম। এরা জাপান-জার্মানিরই লোক। বেটারা দেশে রাজদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করছে।

পরেশদা একটু ভেবে বলল: কিন্তু লড়াইএ জার্মান ও জাপান দুটোই ত নিকেশ হয়েছে। এতদিনে তবে বেটারা প্রপাগ্যাণ্ডা করতে বের হল কোন্ সাহসে? লড়ার ত এখন শেষ।

আমি বুদ্ধিমানের মতো মাথা নেড়ে বললাম: লড়াই থেমেছে বলেই ত এরা বেরিয়েছে। যুদ্ধের পরবর্তী কালই ত বিপ্লবের মহেন্দ্রযোগ। কিন্তু বেটাদের কি সাহস দেখেছ? দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাজপথে বিপ্লবের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।

পরেশ : শহরের পুলিশরাই বা গেল কোথায়? ওরা এ বেটাদের গ্রেফতার করছে না কেন!

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। বললাম : চল আমরা পুলিশ কমিশনারকে এত্তেলা দেইগে। এতগুলো ফিফ্থ্ কলামিস্টকে ধরিয়ে দিলে নিশ্চয় আমরা পুরস্কার পাব। হয়ত বা প্রমোশনও পেয়ে যেতে পারি। আর জান দাদা, বরাতে থাকলে টাইটেল-টুইটেলও মিলে যেতে পারে দু-একটা।

ঈদ ও পূজার হন্তদন্ত কথা ভুলে গেলাম।

দুই বন্ধু ছুটলাম লালবাজারের দিকে। হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে উঠলাম পুলিশের বড় সাহেবের অফিসে।

মিছিলের কথা শুনে সাহেব পাশের শেল্‌ফ থেকে একটি ফ্ল্যাটাফাইল টেনে বের করলেন। ফাইলটার দু'তিন পাতা উল্টাবার পরে বললেন: হ্যাঁ। আজ মিছিল বার করবার জন্য পারমিশন নেওয়া আছে দেখছি। কিন্তু এ পারমিশন ত কতকগুলো বেকার সমিতির মিছিলের কোনো রাজনৈতিক ডিমনস্ট্রেশন হবার কথা নয়। বদমায়েশরা তবে কি সরকারের চোখে ধূলো দিয়ে এই পঞ্চম-বাহিনীর মিছিল বের করল? এ খবরের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা এখন যেতে পারেন। সরকার আপনাদের এ রাজভক্তির কথা স্মরণ রাখবেন। আমি বদমায়েশদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করছি আসুন তাহলে। গুডমর্ণিং।

সাহেব ফোন ধরলেন। আমরাও সেলাম করে বিদায় হলাম।

(ঘ)

পরদিন খবরের কাগজে পড়লাম পুলিশ শহরের বিভিন্ন মহল্লায় খানাতল্লাশ করে অনেকগুলো পঞ্চমবাহিনীকে গ্রেফতার করেছে।

খবরের কাগজে ছাপার হরফে বের হল, ঐ-সব পঞ্চমবাহিনীর দল মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্ট উচ্ছেদ করবার জন্য জাপান ও জার্মানির সঙ্গে বিপুল ষড়যন্ত্র করেছিল, পুলিশও তার বহু প্রমাণাদি হস্তগত করেছে।

শহরে চাঞ্চল্য পড়ে গেল।

খবরের কাগজের সম্পাদকরা বুদ্ধি কল্পনা ও অনুমানের কসরত করতে লাগলেন। 'বিশেষ সংবাদদাতা' ছুটা-ছুটি করতে লাগলেন। সাংবাদিক 'স্কুপের' প্রতিযোগিতা চলতে লাগল।

ফলে দেশশুদ্ধ লোক বুঝে নিল: হিটলার টোজো প্রমুখ 'ওয়ার ক্রিমিনালরা নিজেদের দেশে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এই শহরে আড্ডা গেড়েছিল। দেশবাসীর কপালগুণে আই. বি. পুলিশের অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে বিরাট ষড়যন্ত্র সময় থাকতে ধরা পড়েছে। তাদের দলকে দল গ্রেপ্তার হয়েছে।

যথাসময়ে প্রকাশ্য আদালতে এদের বিচার হবে।

ওদের প্রকাশ্যে বিচার দেখবার জন্য দেশকে-দেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

(ঙ)

যথা সময়ে রাজদ্রোহী আসামীদের বিচার শুরু হল।

ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। চারদিকে বন্দুকধারী পুলিশ পাহাড়া দিচ্ছে। সাংঘাতিক রকমের আসামী কি না।

ঠিক সাড়ে দশটায় আসামীদের প্রিজন-ভ্যানে করে আনা হল। উত্তেজিত বিপুল জনতা তাদের দেখবার জন্য হুড়াহুড়ি করতে লাগল।

আসামীদের কাঠগড়ায় তোলা হল। দেখা গেল আসামীদের মধ্যে হিটলার-টোজোরা কেউ নেই; তার বদলে অল-ইণ্ডিয়া চেম্বার-অব-মার্চেন্টের সভাপতি ভূতপূর্ব মেয়র রায়বাহাদুর ঘনশ্যাম হেদারাম পাগড়ীওয়ালা, 'অল-বেঙ্গল এ, আর, পি, ওয়ার্কার্স লীগের সেক্রেটারী ভূতপূর্ব অধ্যাপক এক্স্ ওয়াই জেড কান্দাহারী, ইন্টারন্যাশনাল কনট্রাক্টর্স এসোসিয়েশনের ক্যাশিয়ার স্যার পশ্চাতম চেট্টি, সিভিল সাপ্লাই এমপ্লয়িজ রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ সি, সি, ঘোষ সি, আই ই, বার-অ্যাট-ল এবং এম, এল, এ প্রটেকশন লীগের সহ-সভাপতি ভূতপূর্ব কৃষিমন্ত্রী খানবাহাদুর মাওলানা হাজী খোন্দকার তুকাব্বর আলী চক্রান্তপুরীর ন্যায় গণ্যমান্য ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকরাই আসামীর বেশে কাঠগড়ায় স্থান পেয়েছেন।

দর্শকেরা পুলিশের উদ্দেশ্যে ছি ছি করতে লাগল।

আদালতের এজলাসেই তারা গোলমাল বাধাল। হাকিম ঘন ঘন ঘন্টা বাজিয়ে এজলাসের শান্তি রক্ষা করতে লাগলেন। দর্শকদের বেশির ভাগেরই উৎসাহ কমে গেল। তারা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

(চ)

ভাঙ্গা এজলাসে বিচার শুরু হল।

সরকারী ওকিল আসামীদের বিরুদ্ধে 'কেস ওপেন' করলেন। ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে তিনি যা বললেন তার মর্ম এই :

আসামীরা সমাজের গণ্যমান্য ও অর্থবিত্তবান প্রভাবশালী লোক। তাই সম্রাটের গভর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করে এ দেশে পাপেট গভর্ণমেন্ট স্থাপন করবার মতলবে জাপানী ও জার্মানীরা এইসব গণ্যমান্য নাগরিককে তাদের এজেন্ট নিযুক্ত করেছে। সরকারের দয়ায় অর্থ ও যশ অর্জন করে এইসব অকৃতজ্ঞ বড়লোক জার্মানির ও জাপানের পঞ্চমবাহিনী সেজেছে। সেইজন্য এঁদের অপরাধ অধিকতর গুরুতর। এঁরা সরকারী রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে শত্রুপক্ষের পতনে রোদন করে মিছিল বের করে রাজভক্ত শান্তি প্রিয় মুক জনসাধারণের মধ্যে রাজদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন এবং সেই

রাজদ্রোহমূলক বে-আইনি কাজ করবার উদ্দেশ্যে সরকারের চোখে ধূলো দেবার মতলবে বেকারদের মিছিল বের করার অজুহাতে পুলিশের লাইসেন্স নিয়েছেন। সুতরাং এদের অপরাধ অমার্জনীয়।

উদ্বোধনী বক্তৃতার পর প্রাথমিক সাক্ষি-প্রমাণাদি দেওয়া হল। চার্জ ফ্রেম করবার আগে হাকিম আসামীদের বক্তব্য শুনতে চাইলেন।

আসামীরা সমস্বরে বললেন: আমরা নির্দোষী। বাকি কথা আমাদের ওকিল বলবেন।

হাকিম আসামীদের ওকিল সাহেবের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকালেন।

ওকিল সাহেব নাটকীয় ভঙ্গিতে অতি ধীরে-ধীরে পাছা উত্তোলন করে মোগলাই ধরনে হাকিমকে একটা কুর্নিশ করলেন এবং গম্ভীর সুরে বলতে লাগলেন:

ইঅর অনার, আমার মওক্কেলদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজদ্রোহের। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যতটুকু তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁরা রাস্তায় মিছিল করে 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান' বলে বুকে এবং দু'একজন কপালেও করাঘাত করছেন। কি কারণে কোন দুঃখে তারা 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান' বলে বুকে কপালে করাঘাত করেছেন সেটা যদি হুজুর জান্‌তে পারেন, তবে রাজদ্রোহের অপরাধে এঁদের জেলে না পাঠিয়ে এদের দুঃখে সমবেদনাই প্রকাশ করবেন।

হাকিম কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন: বলেন কি মশায়? কি সে কারণ?

সরকারী ওকিলও চোখ বড় করে আসামির ওকিলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আসামির ওকিল বলতে লাগলেন: হুজুর জাপান ও জার্মানি এবারকার মহাযুদ্ধ বাধিয়েছিল, এটা ত ঠিক? সরকারী ওকিল কি বলেন?

সরকারী ওকিল ও হাকিম উভয়েই বলেন: এটা ত ঠিক, এ বিষয়ে মতভেদ নেই।

আসামির ওকিল : যুদ্ধ বেধেছিল বলেই ব্ল্যাকমার্কেট হয়েছিল, মিলিটারি কন্ট্রাক্ট হয়েছিল, এ, আর, পি, হয়েছিল; আর সর্বোপরি যুদ্ধ বেধেছিল বলেই ত আইনসভার আয়ু পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছর হয়েছিল। যুদ্ধ না বাধলে এসব হত না, এটা ঠিক কি না? সরকারী ওকিল কি বলেন?

হাকিম ও সরকারী ওকিল পরস্পরের দিকে চাইলেন। উভয়ে বললেন: এটাও ঠিক কথা।

আসামীর ওকিল বিজয়োল্লাসে একবার সামনে একবার পিছনে তাকিয়ে বললেন: নাউ ইঅর অনার, যাঁরা ব্ল্যাকমার্কেট থেকে মিলিটারি কন্ট্রাক্ট থেকে এবং আইনসভা থেকে টু-পাইস রোজগার করেছেন তারা জাপান ও জার্মানির দৌলতেই তা করেছেন, এটা ঠিক কি না?

হাকিম ও সরকারী ওকিল: তা ত বটেই, তা ত বটেই।

আসামীর ওকিল গলার স্বর আরো উচা করলেন। বললেন: তাহলে ইঅর অনার, জাপান ও জার্মানি যদি ঠিকমত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত এবং এত তাড়াতাড়ি ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ না হয়ে যদি ১৯৫০ সালে শেষ হত, তাহলে এঁরা আরো টু-পাইস লাভ করতে পারতেন, এটা সত্যি কি না।

হাকিম ও সরকারী ওকিলের গলা শুকিয়ে আসল। তবু বলতে বাধ্য হলেন। তাই ত মনে হচ্ছে।

আসামীর ওকিল গর্বভরে মৃদু হেসে বললেন: শুধু মনে হচ্ছে কেন হুজুর এটাই ঠিক কথা। আর জাপান ও জার্মানির নির্বুদ্ধিতায় যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় আমার এই মওক্কেলদের যে গুরুতর লোকসান হয়েছে, সেটা ইঅর অনার দেখতে পাচ্ছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর মহোদয়ও সেটা স্বীকার করবেন! এখন তাঁরা 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান' বলে রোদন করতে পারেন কি না এ কথা আমি ইঅর অনারকেই জিজ্ঞাসা করছি।

হাকিম ভাবনায় পড়লেন।

সরকারী ওকিল দেখলেন তাঁর মোকদ্দমা ফসকে যায়। তাই তিনি শেষ চেষ্টা করে বললেন:

লোকসান হলে হায়-হায় করার অধিকার সবারই আছে; কিন্তু মিছিল করে করবেন কেন? ঘরে বসে হায় হায় করলেই পারতেন! অন্তত; এঁরা পাবলিক নুইসেন্সের অপরাধ করেছেন।

আসামীর ওকিল : মিছিল করে হায় হায় করবে কি ঘরে বসে করবে, সেটা নির্ভর করে শোক ও লোকসানের তারতম্যের উপর। গরিব লোক মারা গেলে আমরা চুপে-চুপে গোবরায় বা কাশি মিত্রের ঘাটে ফেলে আসি। কিন্তু বড়লোক মরলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে মিছিল করে শহর গরম করে তুলি না কি?

সরকারী ওকিল আরো কি বলবার জন্যে লাফিয়ে উঠলেন।

হাকিম জোরে-জোরে ঘন্টা বাজিয়ে বললেন। অর্ডার অর্ডার আমি আর কোন কথা শুনব না। আসামীদের আমি খালাস দেব। শুধু তাই নয়। আমি বুঝতে পারছি, আমি ওকিল মানুষ যে আজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছি, তাও জাপান ও জার্মানির দৌলতে। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় আমারও চাকরি আজ বিপন্ন। কাজেই আমারও আজ 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান' করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর খালি হাতে না ফেরবার শেষ চেষ্টা করে বললেন: কিন্তু ইঅর অনার, এই যুক্তিতে এম এল এ, আসামীদের আপনি খালাস দিতে পারেন না তারা ত আর যুদ্ধের চাকুরে নয়।

হাকিম : এ কথা অবশ্য ঠিক। দে আর নট চিলড্রেন-অফ ওয়ার।

আসামীর ওকিল: এটা হুজুর কেবল দৃশ্যতই ঠিক। কারণ এম. এল. এরা যুদ্ধের সন্তান নয় বটে, কিন্তু তারা যুদ্ধের পোষ্যপুত্র। পাঁচ বছরের মেয়াদে মেম্বর হয়ে দশটি

বছর যে এঁরা নিরাপদে কাটিয়ে দিলেন, সে ত জাপান-জার্মানির কৃপায়। হতভাগারা যদি আর কটা বছর যুদ্ধ চালাতে পারত, তবে অনেক এম, এল, এ, ঐ পদে জিন্দিগি কাবার করে দিতে পারতেন; নির্বাচনের ঝনঝাট আর তাঁদের পোহাতে হত না। তাছাড়া আর কিছুদিন যুদ্ধ-যুদ্ধতে এম, এল, এ, থাকতে পারলে ভবিষ্যতে এম, এল, এ, হবার আর দরকারই হত না।

হাকিম : তা হোক, কিন্তু আইনসভা ত আর উঠে যাচ্ছে না। আবার ত নির্বাচন হচ্ছে।

আসামীর ওকিল : সেইটেই ত বিপদ। তবে আর বলছি কি হুজুর? আবার যে নির্বাচন হবে, তাতে পুরান এম. এল. এ দের ভরসা খুব কম। তার উপর অনেকে দু-তিনখানা শাদি করে খরচ বাড়িয়ে ফেলেছেন। এম, এল, এ গিরি না থাকলে এঁরা ওদের খোরপোশ দিবেন কোথা থেকে? তাই হুজুর দেখতে পারছেন, এঁদের বেদনা কত গভীর।

হাকিম : বুঝলাম, এরাও আমাদের মতই সাফারার। আমি সবাইকে বেকসুর খালাস দিলাম।

বলে হাকিম চেয়ার ছেড়ে উঠে আসামীর কাঠগড়ার দিকে গেলেন। তাঁদের হাতে হাত মিলিয়ে তিনি মিছিল করে বেরিয়ে গেলেন। সমবেত গলায় ধ্বনি করলেন: 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান'।

চাপরাশী আর্দালীরা একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

চমক ভাঙলে তাদেরও অনেকে মিছিলের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে বলতে লাগল: 'হায় জাপান' 'হায় জার্মান।'

১. আশ্বিন–১৩৫২

আইনসভায় ইলেকশন।

চারদিকে ক্যানভাসের ধুম পড়েছে। দিন-রাত সভা-সমিতি ও বক্তৃতা চলছে। কর্মী ও ক্যানভাসারদের তাগিদে সবাই অস্থির। যারা বাড়িতে থাকে, তারা বাড়ি ছেড়ে পলাচ্ছে; যারা মাঠে কাজ করে তারা মাঠ ছেড়ে ঘরের কোণে আশ্রয় নিচ্ছে।

ছয়আনা ট্যাক্স দেনেওয়ালারা এই প্রথম ভোট দিবার মালিক হয়েছে। সুতরাং ভোটার অনেক। কিন্তু প্রার্থীও কম নয়। দু'তিনটি থানা মিলে একজন মেম্বর পাঠাবে; কাজেই ক্যান্ডিডেটের ভিড় হয়েছে খুব বেশি। সাধ্যমত ক্যানভাসও করছে সবাই!

কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ক্যানভাস চলছে খানবাহাদুর সাহেবের এবং মুনশি সাহেবের। খানবাহাদুর সাহেব এ অঞ্চলের লোক, কিন্তু সদরে ওকালতি করেন। সদরে দু'তলা ও গাঁয়ে একতলা পাকা ইমারত আছে। তিনি সদরে আঞ্জুমন-ই-ইসলামিয়ার সেক্রেটারি। এই আঞ্জুমনের তরফ থেকেই তিনি প্রার্থী হয়েছেন। আঞ্জুমনের তরফ থেকে শহরের বহু ওকিল-মোখতার-ডাক্তার ইশ্‌তাহার জারি করেছেন খানবাহাদুর সাহেবের সমর্থনে। এইসব ইশ্‌তাহার বস্তা-বস্তা বাড়ি-বাড়ি হাটে-বাজারে ও সভা-সমিতিতে বিলি হচ্ছে।

ঐ-সব ইশ্‌তাহারে অনেক ভাল-ভাল কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক অধিকাংশই উম্মি। ঐ-সব ইশ্‌তাহারের ভাল কথা তারা পড়তে পারে না। বুড়ারা ঐ-সব ইশ্‌তাহারে করে বাজার থেকে মাছ নিয়ে যায়; আর ছোঁড়ারা ঘুড্ডি বানায়।

কিন্তু ক্যানভাসাররা ছাড়বার পাত্র নয়। তারা সভা-সমিতিতে জুম্মার নামাজের জমাতে এবং হাট-বাজারের অলি-গলিতে দাঁড়িয়ে সেইসব ইশ্‌তাহার গলার জোরে চিৎকার করে পড়ে শুনায়। সুতরাং পড়তে না জেনেও ভোটাররা ঐ-সব ইশ্‌তেহারের কথাগুলি মোটামুটি মুখস্থ করে ফেলেছে।

কথাগুলি এই: মুসলমানরা রাজ্য-হারা হয়েছে। তারা শিক্ষা-দীক্ষায় অপরাপর লোকের অনেক পিছে পড়ে গিয়েছে। বাণিজ্য ব্যবসাতেও মুসলমানদের স্থান নেই। এ সব ফিরে পেতে হলে এবং ধর্মরক্ষা করতে হলে মুসলমানদের দলবদ্ধ হওয়ার

দরকার। এই উদ্দেশ্যেই আঞ্জুমন কায়েম করা হয়েছে। খানবাহাদুর সাহেবকে ভোট দিয়ে আঞ্জুমনকে শক্তিশালী করা সকল মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

প্রায় সকলেই বুঝেছে কথাগুলো ঠিক। সুতরাং খানবাহাদুর সাহেবকে ভোটও তারা দিত। কিন্তু গোলমাল বাধিয়েছে মুনশি সাব। ইশতাহারের বক্তা তাঁর ছোট এবং কর্মীর সংখ্যা তাঁর কম বটে, কিন্তু মুনশিজী এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। করেন তিনি খন্দকারী পেশা। তার উপর আছে তাঁর একটি পঁয়ত্রিশ টাকা দামের ঘোড়া! দৌড়ে সে ঘোড়া ঘন্টায় চারি মাইলের কম যায় বটে, কিন্তু মাসের মধ্যে ত্রিশদিন চব্বিশ ঘন্টাই সে পিঠে গদি বহন করতে পারে।

এই ঘোড়া এবং জন ত্রিশেক ছেলে-ছোকরা নিয়েই মুনশিজী সারা অঞ্চল মুখরিত করে তুলেছেন। তিনি ইশ্‌তাহার ছাপিয়ে বিলি করেছেন; বক্তৃতা করে সভা মাতিয়েছেন।

তাঁর বক্তৃতা ও ইশ্‌তাহারের কথাগুলো এই: চাক্‌রি-বাক্‌রি আসল কথা নয়। চাকরি পাবে দু'দশজন বড় লোকে এম. এ. বি. এ, ছেলেপিলে। আসল কথা হল খাজনা ও ঋণ। জমিদার ও মহাজনের জুলুমে দেশের সকল লোক মারা পড়েছে। কৃষক-প্রজারা দিনরাত খেটে জমি থেকে ফসল ফলায়। জমিদার ও বড়লোকেরা সেই ফসলের টাকায় দালান-কোঠা তোলে ও মোটর দৌড়ায়। কৃষক প্রজারা না খেয়ে মরে। তাই মুনশিজীরা প্রজাপার্টি গঠন করেছেন বড়লোকের জুলুম বন্ধ করবেন। অতএব মুনশিজীকে ভোট দেওয়া সকল কৃষক-প্রজারই উচিৎ। ওকিল-মোখতারকে ভোট দেওয়া উচিত নয়। কারণ ওকিল-মোখতারই জমিদারি জুলুমের হাতিয়ার।

খানবাহাদুরের লোকেরা দেখল বিপদ। সব লোক মেতে উঠেছে জমিদারি উচ্ছেদের নামে। শুধু ধর্মের কথা আর লোকেরা তেমন শুনছে না।

বলল তারা খানবাহাদুরকে সব কথা। খানবাহাদুর অগত্যা বললেন: তোমরাও চালাও জমিদারি উচ্ছেদের কথা। যা বললে লোকে ভোট দেয় তাই বল।

তাই বলা হয়। আবার ইশতাহার জারি হল: খানবাহাদুর সাহেব আঞ্জুমন ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চায়, খাজনা কম করতে চায়, বড়লোকের জুলুম দূর করতে চায়।

মুনশিজী পাল্টা ইশতাহার জারি করলেন: খানবাহাদুরের এসব কথা ধাপ্পাবাজি। তিনি নিজে বড় লোক। জমিদারের ওকিল। তাঁদের আঞ্জুমনের মেম্বররা সবাই তাই। ওঁরা উচ্ছেদ করবেন জমিদারি? করবেন যদি, তবে আগে বলেননি কেন?

ভোটাররা খানবাহাদুরকে বিশ্বাস করল না। তার চালাকি মুনশিজী তুখোর বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে। চারদিকে সারা পড়ে গেল; গরিব লোকেরা ভোটাধিকার পেয়েছে, এইবার আইনসভা হতে বড়লোক তারাও।

ভোটের দিন ভোটাররা খানবাহাদুরের মোটরে চড়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে মুনশিজীর বাক্সে ভোটের কাগজ ফেলে খানবাহাদুরের পানবিড়ি কতক খেয়ে কতক পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

যথাসময়ে ভোট গণনা হল। খানবাহাদুর পেয়েছেন দু'হাজার আর মুনশিজী পেয়েছেন তের হাজার। মুনশিজী যথারীতি নির্বাচিত হলেন বলে ঘোষণা করা হল।

সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করল: 'জমিদারি ধ্বংস হোক'; 'কৃষক প্রজার জয় হোক'; লাঙ্গল যার মাটি তার 'জয় মুনশিজী কি জয়'!

(২)

যথাসময়ে মুনশিজী আইনসভায় হাজিরা দিতে কলকাতাভিমুখে রওয়ানা হলেন। রেলস্টেশনে কৃষক-প্রজারা জমায়েত হয়ে জয়ধ্বনি করে তাঁকে বিদায় দিল: আশে-পাশের জমিদার-কাছারি কাঁপিয়ে আসমানে ধ্বনি হল: জমিদারি ধ্বংস হোক!

কিছুদিন পরে মুনশিজী ফিরে এলেন। তিনি তহবন্দ পরে গিয়েছিলেন, শেরওয়ানি পরে এলেন। পায়ে হেঁটে স্টেশনে গিয়েছিলেন ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ফিরে এলেন। সব দিকেই খবরাখবর ভাল। কিন্তু জমিদারি উচ্ছেদ হয়নি। খাজনাও কমেনি।

প্রজারা সব মুনশিজীর কাছে পুছ্ করল হাল-হকিকত। মুনশিজী বললেন: কোন ভাবনা নেই। জমিদারি উচ্ছেদের আয়োজন ঠিক-ঠাক।

খাতেরজমা হয়ে সবাই বাড়ি ফিরল।

গেল অনেক দিন। মুনশিজী কলকাতা গেলেন অনেক বার। ফিরেও এলেন বহুবার। কিন্তু না কমল খাজনা, না উঠল জমিদারি। ইতিমধ্যে মুনশিজীর বাড়ির ছেলে-পিলেদের ভাল-ভাল নতুন ধরনের কাপড়-চোপড় পরতে দেখা গেল। মেয়েদের মুখে শোনা গেল মুনশিজীর বিবির ভাগ্যেও নতুন জুতা-জামা ও শাড়ি-গহনা জুটেছে কিছু।

আস্তে-আস্তে কানকথা চল্‌তে লাগল। গাঁয়ের পড়ুয়া ছেলে-পিলেরা বলতে লাগল: তাদের পাঠশালার মাস্টাররা নাকি বলছেন: আইনসভার মেম্বররা হাজার টাকা করে নিজেদের মাইনে বরাদ্দ করেছেন। সাপ্তাহিক খবরের কাগজে উঠেছে এসব কথা।

গাঁয়ের লোক ভাবল: হবেও বা। মুনশিজীর চেহারা দেখে তাই ত মনে হয়।

এক দুই করে জনকতক লোক কথাটা পেড়েই ফেলল মুনশিজীর নিকট।

মুনশিজী ত চটেই টং। খবরের কাগজের কথা ছেড়ে দাও। খবরের কাগজওয়ালা বেটারা কারো ভাল দেখতে পারে না। বছর দিঘালি বাড়ি ঘর ছেড়ে বিদেশে পড়ে-পড়ে প্রজার মঙ্গলের জন্য খাটব; আর তার জন্য খাওয়া-খোরাকি বাবদ দু'দশটা টাকা নিতে পারব না? তবে কি আমরা হাওয়া খেয়ে থাকব? যত সব ইয়ে–। কলকাতা এমন জায়গা যেখানে পানি পর্যন্ত কিনে খেতে হয়।

সকলে বুঝল সত্যই ত। কলকাতায় ত আর মুনশিজীর ঘরগেরস্থালি নেই। মাইনে নেবে না ত চলবে কি করে? বিশেষত পানিটাও যখন কিনে খেতে হয়।

গেল কয়েক বছর। জমিদারি উঠল না। খাজনার চাপ বেড়েই চলল। বহু প্রজার ভিটা-বাড়ি উচ্ছন্ন হল। তারা এল মুনশিজীর কাছে।

মুনশিজী বললেন: চেষ্টার ত তিনি কম করছেন না। বড় কাজ। সময় একটু লাগবেই ত। এত আর দা-ছেনের আছাড়ি নয় যে টান মারলেই খসে যাবে! একা লোক তিনি ক'দিক সামলাবেন।

কৃষক-প্রজারা বুঝল: তাদের ব্যস্ততা কত অন্যায়। তারা সবুর করল কাজেই।

হঠাৎ দেখা গেল মুনশিজীর জমি-জমা বেড়ে গিয়াছে। বাকি খাজনার দায়ে জমিদারেরা যেসব প্রজার জমি নিলাম করেছিল, প্রজা-সমিতির জোট পাকানোর ফলে যেসব জমি এতদিন কোন প্রজাপত্তন হয়নি। সে সব জমি তাই এতদিন পতিত পড়ছিল। শোনা গেল মুনশিজী স্বয়ং সে পত্তন নিয়েছেন।

যাদের জমি তারা গিয়ে কেঁদে পড়ল মুনশিজীর কাছে।

তিনি বললেন: ওদের ভালর জন্যই মুনশিজী এ কাজ করেছেন। মুনশিজী না নিলে প্রজার দুশমন কেউ ওসব জমি নিয়ে নিত-তাতে প্রজারা জমি ছাড়া হত। মুনশিজী নেওয়াতে জমি প্রজাদের নিজেদেরই থাকল। অথচ খাজনা দেবার দায় আর ওদের রইল না! সেটা এর পর মুনশিজীই চালাবেন। ওরা জমি চাষ করে মুনশিজীকে শুধু অর্ধেক ফসল দিবে। জমিদারি উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলবে। তারপর যার জমি তাকেই ফেরত দেওয়া হবে। এমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কেউ করত? শুধু মুনশিজীর দয়ার শরীর বলে!

গাঁয়ের লোক বুঝল: ব্যবস্থা মন্দ নয়। জমিদারের হাত থেকে ত জমিগুলো উদ্ধার হল! মুনশিজী ত নিজের লোক তিনি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবেন।

গেল আরো কয়েক বছর!

একদিন সকালে গাঁয়ে রাজমিস্ত্রি দেখা গেল। মুনশিজীর জমির উপর ইটের পাঁজা পোড়ান হল। কাঠ-বাঁশ লোহা-লক্কর এল গাড়ি বোঝাই হয়ে।

মুনশিজীর নয়া জমিতে দালান উঠল। ঘাট-বাঁধা পুকুর হল। ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা থেকে রাস্তা গেল মুনশিজীর বাড়ি তক।

গাঁয়ের লোক কাতার করে তামাসা দেখল। বাড়ি তৈরি শেষ হলে যথাসময়ে ধুমধামের সঙ্গে মিলাদশরিফ পড়িয়ে মুনশিজী নয়া দালানে উঠে গেলেন।

শহর থেকে অনেক ভদ্রলোক গৃহ-প্রবেশ-উৎসবে যোগ দিলেন।

সকলে মুনশিজীর নয়া বাড়ির তারিফ করলেন! পাড়াগাঁয়ে এমন সুন্দর বাড়ি আর দেখা যায় না।

উৎসব শেষে গাঁয়ের লোকের হুশ হল। এক মুখ দু'মুখ হতে হতে নানা কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। শেষে মুনশিজীকে বলাই হল। কোথায় জমিদার ও বড়লোক ধ্বংস করে চাষীদের উন্নতি করবেন, তা না নিজেই দালানওয়ালা বড়লোক হয়ে গেলেন মুনশিজী?

মুনশিজী বললেন: এই ত উম্মি লোকের নাদানি। শুনলে ত তোমরা শহরের ভদ্রলোকদের কথা? পাড়াগাঁয়ে সুন্দর বাড়ি-ঘর না হলে পাড়াগাঁর উন্নতি হবে কোথা

থেকে? রাস্তা-ঘাট না হলে লোকে চলা-ফিরা করবে কিসে? আমি ত গাঁয়েরই লোক। আমার উন্নতিতে গাঁয়েরই উন্নতি। একজন দু'জন করেই ত উন্নতি করতে হবে; সবাই কি একসঙ্গে বড় হয়? তোমাদের ছেলে-পেলে কি সবাই এক সমান বড়? হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান? আমি ইট পুড়িয়েছি, তোমাদেরও ত কাজে লাগতে পারে।

সবাই বুঝল: ঠিক কথাই ত। অনেকেই মুনশিজীর পাঁজা থেকে ভগ্নাবশিষ্ট দু'চারখানা ইট নিয়ে গেল। কেউ বা তা দিয়ে ঘরের সিঁড়ি তৈরি করল। আর কেউ-কেউ চৌকিরপায়ার নিচে ইট দিল।

এইভাবে মুনশিজীর দৌলতে ইটের মুখ দেখে অনেকে চুপ করে গেল। আস্তে-আস্তে মুনশিজীর বিরুদ্ধে আলোচনা কমে গেল।

সেবার অজন্মা হয়েছে। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে। খোরাকীর অভাবে অনেক লোক মারা যাচ্ছে। প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না।

জমিদারের আমলা-ফয়লা পাইক-পিয়াদারা খাজনার তাগিদে সারা গাঁ তচ্‌নচ্‌ করে ফেলল। ভয় দেখাল খাজনা না দিলে জমিদারি হয় কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে যাবে, নয় সদর খাজনার দায়ে নিলাম হবে। বুঝবে তখন প্রজারা বছরে ক'দিন যায়! এমন দয়ালু জমিদার আর পাবে না। অন্য জমিদার এসে প্রজার হাড় পিষে ফেলবে।

প্রজারা ভয় পেল। কিন্তু খাজনা দেবার শক্তি তাদের ছিল না। হাড়েও তাদের কিছু ছিল না। কাজেই হাড়পেষার আশঙ্কায় তাদের আঁৎকে উঠতে দেখা গেল না। তাছাড়া মুনশিজীত রয়েছেন। তিনি ত জমিদারি উচ্ছেদই করে দিচ্ছেন। এ জমিদারের জমিদারি নিলাম হয়ে অন্য জমিদার আসবার সময় পাচ্ছে কোথায়? তার আগেই ত যাবে জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে।

মুনশিজীকে পুছ করা হল। তিনি ভরসা দিলেন। আর বেশি দিন লাগবে না। তিনি বিল পেশ করেছেন। সিলেক্ট কমিটি বসেছে। আর বেশি দেরি নেই।

সকলে সোয়াস্তি পেল। যারা হাল-গরু ও ঘটি-বাটি বিক্রি করে খাজনা দিতে যাচ্ছিল, তারা বিরত হল।

জমিদারের লোকজন বহু উৎপাত চিৎকার ও হট্টগোল করে খালি হাতে ফিরে গেলে।

সাঁজ আইনে জমিদারি নিলাম হয়ে গেল।

ভাগ্যিস নিলামের দিন মুনশিজী সদরে হাজির ছিলেন। তিনিই নিলামে সে জমিদারি খরিদ করে নিলেন! নইলে অন্য জমিদারের হাতে পড়লে প্রজাদের আর রক্ষা ছিল না।

তার বাদে যথাসময়ে আদালত হতে নাজির এসে মুনশিজীকে জমিদারিতে দখল দিয়ে গেল। মুনশিজীও খাজনার তাগাদায় প্রজাদের উপর নোটিশ করতে লাগলেন।

তখন প্রজারা দল বেঁধে মুনশিজীর কাছে এসে বলল: এ কি রকম হল মুনশিজী? জমিদারি উচ্ছেদ করতে গিয়ে আপনি নিজেই জমিদার হয়ে বসলেন?

মুনশিজী হেসে বললেন: এই ত তোমরা উম্মি লোক কিছু বুঝতে পারছ না। জমিদারিটা অপরে নিয়ে গেলে কি তোমাদের ভাল হত? তোমরা খাজনা যা দিতে, তা ভিন গাঁয়ের লোকে নিয়ে যেত। এখন তোমরা খাজনা দিবে, সব তোমাদের গাঁয়েই ত থেকে যাবে। আপদ-বিপদে হাত বাড়ালেই পাবে। আগে জমিদারিটা অপরের হাতে ছিল কাজেই ওটা উচ্ছেদ করা কঠিন ছিল! এখন নিজের হাতে নিয়েছি, যখন ইচ্ছে তখন উচ্ছেদ করতে পারব। আমার প্রথম ধাক্কায় জমিদারি উচ্ছেদ হয়নি বটে, কিন্তু জমিদার ত উচ্ছেদ হয়েছে। একবারের চেষ্টায় এর বেশি আর কি করা যায়?

এই ত তোমরা উম্মি লোক কিছু বুঝতে পারছ না

প্রজারা ভাবতে লাগল। মুনশিজী বলতে লাগলেন:

এ যাত্রায় জমিদারি উচ্ছেদ করতে পারিনি বটে, কিন্তু জমিদারকে কাবু করে ফেলেছি; ওর বুকে চড়ে বসেছি; জমিদারি দখল করেছি। তোমরা প্রজা। আমি তোমাদের প্রতিনিধি। আমার জমিদারি দখল করা মানেই প্রজার জমিদারি দখল করা। এও এক রকম জমিদারি উচ্ছেদ বৈকি? প্রথম চেষ্টায় আমি এতখানি করেছি। আবার যদি আমায় ভোট দাও, তবে বাকিটাও সাবাড় করে ফেলব।

সকলে বুঝল: কথাটা মিথ্যা নয়। মুনশিজী ঠিকই বলেছেন: আয়েন্দাতেও তাঁকেই ভোট দিতে হবে।

১ পৌষ—১৩৫১

ইনফ্যান্ট ক্লাশ

অনেক ছুটোছুটি, অনেক চেষ্টা-তদবির এবং অনেক খোশামোদ করেও যখন ইয়াকুব একটা চাকরি যোগাড় করতে পারল না তখন ....

ইয়াকুব হঠাৎ কসম খেয়ে বলল: সে জনসেবা করেই জীবন কাটিয়ে দেবে। সে ভাবল: নিজের জন্য যখন কিছু করতে পারলাম না, তখন পরের জন্য নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পারব।

শুধু এই প্রতিজ্ঞা করেই, অর্থাৎ জনসেবায় হাত দেওয়ার আগে ইয়াকুব দেখতে পেল: সুযোগ-সুবিধা বা ক্ষমতা হাতে না থাকলে জনসেবাও করা যায় না। চাক্‌রির পেছনে ছুটাছুটি করে ইয়াকুবের যেটুকু চোখ ফুটেছিল তা থেকে সে দেখতে পেয়েছিল যে, আত্ম-সেবা করতে হলেও যেমন কোন-না কোন যুনিভার্সিটির ডিগ্রির দরকার, জনসেবা করতে হলেও তেমনি জনসেবা য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রির প্রয়োজন। কিন্তু সে জ্ঞান ইয়াকুব পেটে-পেটেই রাখল, কারো কাছে প্রকাশ করল না।

কারণ জ্ঞান যারা প্রচার করে তারা অজ্ঞান।

তাই ইয়াকুব দেশবাসীকে বলল: তোমরা যখন আমায় সেবা করলে না, তখন আমিই তোমাদের সেবা করব। তোমরা সে দায়িত্ব আমায় দাও

বন্ধুরা বলল: জনসেবা করতে চাও কর না! কে তোমায় ঠেকাচ্ছে? দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে; দুঃখী রোগী বিপন্নের ত অভাব নেই; তাদের সেবায় লেগে গেলেই পার। কে তোমায় বারণ করছে?

ইয়াকুব বলল: বারণের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে দায়িত্বের কথা। যাদের সেবা করব, তাদের অনুমতির দরকার আছে বই কি? তাছাড়া দু-দশ জন রোগীর সেবা করাকে

শুশ্রূষা বলতে পার, জনসেবা বলতে পার না। আমি ব্যক্তিগত শুশ্রূষা করতে চাই না; আমি চাই জনসেবা করতে।

বন্ধুরা তর্কে হেরে গেল।

তারা ইয়াকুবের পরামর্শ অনুসারে সভা করে প্রস্তাব পাশ করল: ইয়াকুব মিয়াকে জনসেবার দায়িত্ব দেওয়া গেল।

ইয়াকুব সন্তুষ্ট হল এবং হাজিরানে-মজলিসকে ধন্যবাদ দিল।

প্রাইমারী

গেল কিছুদিন।

কিন্তু ইয়াকুবের জনসেবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

বন্ধুরা বলল: এ কি হে ইয়াকুব, তোমার জনসেবার ত কোন ভাবগতিক দেখছি না। দায়িত্ব পেয়েও যে দিব্বি বসে রয়েছ?

ইয়াকুব রাগ করে বলল: শুধু দায়িত্ব দিলেই ত হয় না, অধিকারও দিতে হয়। অধিকার ছাড়া দায়িত্ব, রেসপনসিবিলিটি উইদাউট রাইট, নিতান্তই অর্থহীন, একথা কি তোমরা নেতাদের মুখে শোন নি? এই যে ইংরেজ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনে মন্ত্রীদের ঘাড়ে শুধু দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়ে অধিকারটা ষোলআনা লাটের হাতেই রেখে দিয়েছেন, তাতে মন্ত্রীরা কিছু করতে পারছেন?

বন্ধুরা দেখল ইয়াকুব সত্য কথাই বলছে!

তারা বলল: তবে এরপর কি করতে হবে আমাদের?

ইয়াকুব : জনসেবার দায়িত্ব যেমন দিয়েছ, তেমনি অধিকারও আমায় দাও।

বন্ধুরা আবার গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আবার সভা বসল। আবার প্রস্তাব পাশ হল। ইয়াকুব মিয়াকে জনসেবার অধিকার দেওয়া গেল।

ইয়াকুব ধন্যবাদ দিয়ে সে অধিকার গ্রহণ করল এবং বাড়ি গিয়ে বসে থাকল।

বন্ধুরা বলল: এ কেমন কথা? অধিকার পেয়েও তুমি জনসেবা করছ না কেন?

ইয়াকুব অসংকোচে বলল: শুধু অধিকার দিলেই কি হয়? আমার ক্ষমতা কোথায়? রাইট উইদাউট পাওয়ার এর কোন মানে আছে?

বন্ধুরা তর্ক জুড়ে দিল।

ইয়াকুব দেশ-বিদেশের নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্ট দেখিয়ে দিল, ক্ষমতা-বিহীন অধিকার বাত-ব্যধিগ্রস্ত পা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বন্ধুরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। তারা বেকুফ হয়ে পুঁছ করল; আর কি করতে হবে আমাদের?

ইয়াকুব সহজ সুরে বলল: আমায় ক্ষমতা দাও।

বন্ধুরা : কি ক্ষমতা চাও?

বন্ধুরা দেখল: ইয়াকুব ঠিকই বলেছে। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানি দখল করতে না পারলে প্রকৃত ক্ষমতার নাগাল পাওয়া যাবে না।

লাগল বন্ধুরা দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করতে। হাজারে-হাজারে হল সভা-সমিতি। সর্বত্র ইয়াকুব হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল একই কথা: আমি জনসেবার সুযোগ চাই। আর কিছু আমি চাই না।

ইয়াকুব জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হল। এবার জনসেবার সাফল্য দেখবার জন্য বন্ধুদের কৌতূহল কান-খাড়া করে রইল।

ইন্টারমিডিয়েট

কিন্তু জনসেবার কোন হিল্লা হল না।

বন্ধুরা সদলে গিয়ে ইয়াকুবকে ধরল: কি হে, এবার ত ক্ষমতার মূলকাঠি হাতে পেয়েছ; এখন জনসেবা হচ্ছে না কেন?

ইয়াকুব সোৎসাহে বলল: সে কথাই ত তোমাদের বলব মনে করছি। কিছুদিন থেকে আমি নিজেই তোমাদের কাছে যাব-যাব ভাবছিলাম। তোমরা নিজেরাই এসেছ, ভালই হয়েছে। এতদিনে জনসেবার একটা হিল্লে করতে পেরেছি।

বন্ধুরা সব একসুরে বলল: করতে পেরেছ? কোথায় কিভাবে?

ইয়াকুব : করতে পেরেছি মানে তার উপায় দেখতে পেয়েছি। জনসেবার ক্ষমতার উৎস কোথায় তার সন্ধান পেয়েছি।

বন্ধুরা : কোথায় সে উৎস?

ইয়াকুব : আইনসভায়-যেখানে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। ভাল-মন্দ আইন সব সেখানে পাশ হয়। জিলাবোর্ড ইউনিয়ন বোর্ড এসব কিছু নয়, সব ফাঁকি, সবই মায়া। আসল কায়া ঐ আইনসভা। সেখানে না গেলে ক্ষমতার নাগালও পাওয়া যাবে না, জনসেবাও করা যাবে না। জিলাবোর্ডের কোন ক্ষমতা নেই জনসেবা করবার।

বন্ধুরা নিতান্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। বলল: সবই যদি ফাঁকি আর মায়া, তবে এসবের পেছনে আমাদের দৌড়ালে কেন?

ইয়াকুব : তা কি আর আমিই জানতাম ভাই। তাছাড়া, এতে না এলে এ কথা বুঝতেই কি পারতাম? এতদিনকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি বন্ধুগণ। পথে না বেরুলে পথ চেনা যায় কি? কাজ করতে-করতেই না লোক কাজী হয়।

বন্ধুরা একটা সান্ত্বনা পেলেও খুব উৎসাহ পেল না। কিন্তু পিছুবারও আর উপায় ছিল না। ইয়াকুব মিয়াকে জনসেবার ক্ষমতা দান করতে ওয়াদা করে ফেলেছে। সে ওয়াদা তাদের রক্ষে করতেই হবে: কাজেই বহুত খেটেখুটে ইয়াকুবকে তারা আইন সভায় পাঠাল।

বি–এ

গেল আরো কিছুদিন।

জনসেবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

বন্ধুরা এল ইয়াকুবের কাছে। ইয়াকুব ত রেগে-মেগেই টং। বেটা মন্ত্রীদের জ্বালায় কিছু করবার উপায় আছে? ইয়াকুব জমিদারি তুলবার, খাজনা কমাবার, পাটের দাম বাড়াবার কত প্রস্তাবই ত দিয়েছে। তার একটাও কি মন্ত্রীরা গ্রহণ করল? যত সব-রা মন্ত্রী হয়ে –হেঁ!

বন্ধুরা এ সবই স্বীকার করল। কারণ তারা খবরের কাগজে এ-সব কথা পড়েছে।

তাই তারা নিরুপায় সুরে জিজ্ঞেস করল: কি তবে এখন করা যায়?

ইয়াকুব নিরুদ্বেগে বলল: মন্ত্রী রে ভাই মন্ত্রী। মন্ত্রী হতে না পারলে কিছু করা যাবে না। তোমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হবে। অথচ আরেকটা ধাক্কার মাত্র ওয়াস্তা। সারা ঘর লেপে দুয়ারে কালি দেবার কারণ নেই। এতদূর এসে পথ প্রায় শেষ করে তোমরা আর ফিরে যেতে পার না, ভাই সাহেবান।

কথা মিথ্যা নয়।

ইয়াকুবের যুক্তির সারবত্তা বন্ধুরা বুঝতে পারল। তাই তারা নানা কল-কৌশলে ইয়াকুবকে মন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দিল!

গদিতে বসে ইয়াকুব বলল: আজ তোমাদের সাধনা সফল হয়েছে। বন্ধুগণ, তোমরা এখন বাড়ি যাও। সেখানে বসে শুধু তামাশা দেখ জনসেবা করব, দেশের চেহারা এমন বদলে দিব যে তোমরা আর দেখে চিনতে পারবে না।

একবন্ধু রসিকতা করে বলল: তুমি আমাদের চিনতে পারবে ত?

ইয়াকুব: সারাদেশের চেহারা বদলে গেলে তোমার-আমার চেহারাও বদলাবে নিশ্চয়! চিনতেই যদি পারলে তবে আর বদলালাম কি?

এম–এ

ইয়াকুব মিয়া মন্ত্রী হল। চেহারাও খুব খানিকটা বদলাল বটে, কিন্তু দেশেরও নয়, জনসাধারণেরও নয়–ইয়াকুবের নিজের। শেরওয়ানি-পাজামা ফেলে, দাড়িমোচ কেটে কোট-প্যান্টুলান পরে ইয়াকুব মিয়া ইয়াকুব সাহেব হল। মেস ছেড়ে সাহেবপাড়ায় বড় বাড়ি নিল। মোটর-চাপরাশী আরদালীতে সত্যই ইয়াকুবকে আর চিনবার উপায় রইল না।

কিন্তু জনসেবার কপালে কোন পরিবর্তন ঘটল না যদিও গেল বেশ কিছুদিন।

বেশ কিছুদিন গেল এইজন্য যে, বন্ধুরা আর ইয়াকুবের দেখাই তেমন পেত না। কারণ চাপরাশী-আরদালীর হাঙ্গামা আছে, ইয়াকুব সাহেবের কর্ম-ব্যস্ততা রয়েছে।

বন্ধুরা বিস্ময়ে বলল: লাট হতে হবে? আমরা তার কি করতে পারি?

ইয়াকুব: অধীর হয়ো না, বলছি। তোমরা সব পার। এতদিন মন্ত্রী হবার জন্য গভর্ণমেন্টকে, ইংরাজ জাতকে অনেক গাল-মন্দ দিয়েছি। কৃষক প্রজার কথা পাকিস্তানের কথা অনেক কিছু বলেছি। এসব করে দেখলাম জনসেবার ক্ষমতা হাত করতে না পারলে কিছুই হবে না। অথচ এসব কথা বললে লাট হওয়াও যাবে না, লাট না হলে জনসেবা করাও যাবে না। তাই জনসেবার খাতিরে আমাকে লাট হতেই হবে এবং লাট হতে গেলে জনসেবার নিন্দে করতেই হবে। তা করার দরুন তোমরা খবরের কাগজে আমায় খুব কশে গাল দিও। তা বলে তোমরা আমায় অবিশ্বাস করো না। তোমরা গাল দিলেই আমি লাট হব এবং এই কৌশলে লাট হয়েই আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা জনসেবায় খাটাব। বুঝতে পারলে?

ইয়াকুবের কথা বন্ধুরা কিছুই বুঝতে পারল না। তবে এটা তারা বুঝল যে ইয়াকুব তাদের আচ্ছা ফাঁকি দিয়েছে।

তাই সত্য-সত্যই তারা গাঁটের পয়সা খরচ করে খবরের কাগজে ইয়াকুবকে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দিতে লাগল।

ডক্টরেট

সে গালের ফল ফলল। ইয়াকুব পয়লা হল খানবাহাদুর; তারপরই হল স্যার। মন্ত্রীগিরিতে লিয়েন রেখে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার হয়ে! সেখানে গিয়ে যা করা দরকার, তার সবই সে করল এবং লর্ড খেতাব নিয়ে দেশে ফিরে এল।

তারপর সাদা লাট বাহাদুরের আকস্মিক মৃত্যুতে লর্ড জ্যাকব দেশের অফিসিয়েটিং লাট হলেন।

এক-এক করে তিন-চারটি বছর লাটগিরি করলেন। প্রতি বছর বন্ধুরা আশা করল: এবার জনসেবার একটা হিল্লে হবেই।

কিন্তু সত্যই হিল্লে হল কি না, বন্ধুরা তা বুঝতে পারল না; কারণ লর্ড জ্যাকবের সঙ্গে তাদের মোলাকাত করাই সম্ভব হয়ে উঠল না।

চার বছর পরে লর্ড জ্যাকব যখন লাটগিরি থেকে রিটায়ার করলেন তখন তিনি সত্য-সত্যই বিরাট একটা জমিদারি সারবান লর্ড বাহাদুর। শুধু খেতাবী লাট বাহাদুর ও অসার স্যার নন।

বন্ধুরা একবার জনসেবার কথা তাকে জিজ্ঞেস করার অবসর পেল না। বরং অভিনন্দন-পত্র ছাপিয়ে তারা লর্ড জ্যাকবকে অভ্যর্থনাই করল। কারণ বন্ধুদের অনেকেই লর্ড জমিদারিতে দেওয়ান-ম্যানেজার নায়েব-নসরদির চাকরি পেল না, তাদেরও পাবার আশা থাকল-নিজের না হলেও তাদের ছেলেপিলে ও জামাইদের। আত্মীয়-বন্ধুরাও সব জন ত বটে। তাদের সেবাও ত জনসেবাই।

তাছাড়া এইবার লর্ড জ্যাকব জনসেবা করলেন খুব। গ্রামে নিজের নামে একটা হাই স্কুল, বাপের নামে একটা খয়রাতী দাওয়াখানা ও মায়ের নামে একটা জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। জিলাবোর্ডের রাস্তা থেকে মোটরে নিজের বাড়ি যাওয়ার জন্য গাঁয়ের মধ্য দিয়ে একটা পাকা সড়ক করলেন। তাতে গাঁয়ের লোকের চলাফেরার কত সুবিধে হল। বাড়ির সামনে পাকা মসজিদ হল। তাতে সবারই ধর্মকাজের সুবিধে হল।

এ সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য জ্যাকব তার জমিদারি ওয়াকফ্ করে দিলেন। বার্ষিক চার লক্ষ টাকার জমিদারি থেকে দুশো টাকা স্কুলের জন্য, পঁচাত্তর টাকা দাওয়াখানার জন্য, পঞ্চাশ টাকা মাদ্রাসার জন্য এবং ছয় টাকা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফনামায় বরাদ্দ করা হল।

তার বাদে লর্ড জ্যাকব হজ্জে আক্বরী উপলক্ষে হজ্ব করতে গেলেন এবং কাঁধে জায়নামাজ ও মুখে দাড়ি নিয়ে আল-হজ লর্ড ইয়াকুব হয়ে দেশে ফিরে এলেন।

চারদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল।

সর্বশেষ দেশবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে আল হজ লর্ড ইয়াকুব বেহেশতে চলে গেলেন।

খবরের কাগজে 'হায় হায়' করা সম্পাদকীয় বেরুল। দেশময় শোক সভায় বক্তারা অশ্রুপাত করল। মিউনিসিপ্যালিটির বড় রাস্তার কোণে লর্ড ইয়াকুবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

তাতে লেখা হল: এই মহাপুরুষ জনসেবায় তাঁর যথা স্বর্বস্ব দান করে গিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর দেশবাসী কর্তৃক এই মূর্তি স্থাপিত হল।

এর খরচাটাও ইয়াকুবের জমিদারি থেকেই দেওয়া হল।

বিদেশী পরিব্রাজকরা আজো এই মূর্তি দেখতে এসে তাঁদের ভক্তি জানিয়ে যান। বছরের একটা দিন আজো দেশবাসী এই মূর্তির পাদদেশে ফুলের মালা দেয়।

ইয়াকুব সাহেবের আদর্শ-জীবনী আজো এই দেশের সকল তরুণ-বৃদ্ধের প্রাণে জনসেবার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

তাই না এদেশের জনসেবকের এমন ভিড়।

১ মাঘ–১৩৫০